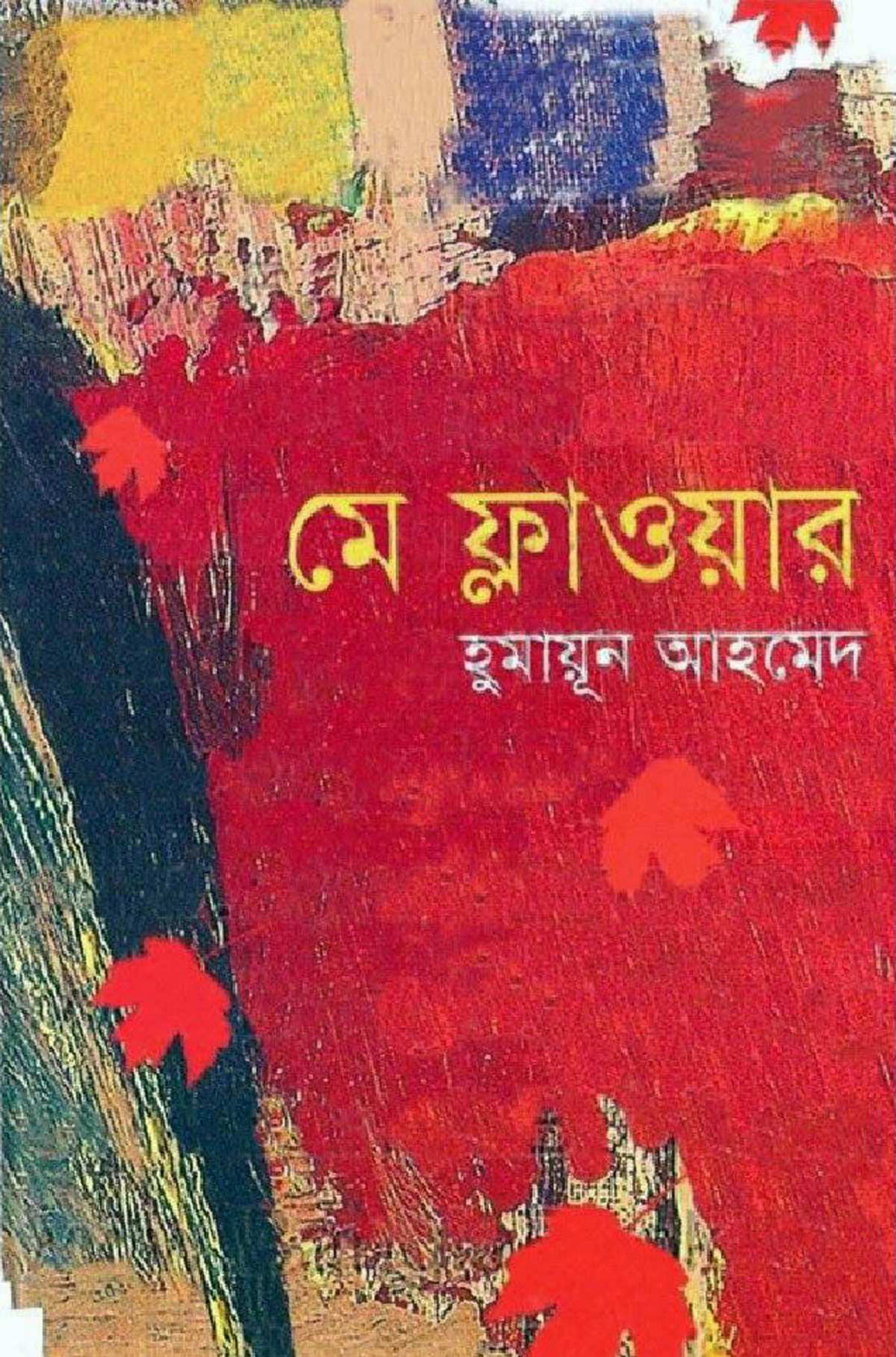
মে ফ্লাওয়ার
হুমায়ূন আহমেদ

যে জাহাজে করে ইউরোপ থেকে খ্রিস্টান ধর্ম প্রচারকরা প্রথম আমেরিকা যাত্রা করেন সেই জাহাজটির নাম 'মে ফ্লাওয়ার'। এই তথ্য 'মে ফ্লাওয়ার' গ্রন্থে উল্লেখ করতে ভুলে গেছি।

গ্রন্থটি পাঠক-পাঠিকারা ভালোবাসার সঙ্গে গ্রহণ করেছেন।

তাদের প্রতি আমার কৃতজ্ঞতার শেষ নেই।

হুমায়ূন আহমেদ
শহীদুল্লা হল, ঢাকা

Heaven gives its glimpses only to those
Not in position to look too close.

(Robert Frost)

দেশের বাইরে বেড়াতে যাবার সুযোগে আনন্দিত হন না– এমন মানুষের সংখ্যা খুবই অল্প। আমি সেই খুব-অল্পদের একজন। বাইরে যাবার সামান্য সম্ভাবনাতেই আমি আতঙ্কগ্রস্ত হই। আতঙ্কগ্রস্ত হবার কারণ আছে– এখন পর্যন্ত আমি কোনো বিদেশ যাত্রা নির্বিঘ্নে শেষ করতে পারি নি।

একবার কিছু লেখকের সঙ্গে চীন গিয়েছিলাম। আমাদের দলনেতা ফয়েজ ভাই। তিনি সারাক্ষণ আমাকে গার্ড দিয়ে রাখছেন যাতে হারিয়ে না যাই। তাঁর ধারণা প্রথম সুযোগেই আমি হারিয়ে যাব। হারালাম না তবে চোখে খোঁচা লাগিয়ে মহাবিপদ ঘটালাম। ডাক্তার দু'টি চোখ ব্যান্ডেজ করে বন্ধ করে দিলেন। পুরো অন্ধ। লেখকরা মহানন্দে ঘুরে বেড়াচ্ছেন, আমি তাঁদের পেছনে তাদের হাত ধরে ধরে হাঁটছি। এই হচ্ছে আমার চীন দেখা।

পাশের দেশ ইন্ডিয়াতে গিয়ে কি ঝামেলায় পড়েছিলাম একটু বলে নেই। সাতদিনের জন্যে গিয়েছি বোম্বে। এলিফেন্ট গুহা, অজন্তা ইলোরা সব দেখা হলো। কোনো রকম ঝামেলা ছাড়াই হলো। এখন দেশে ফিরব। রাত তিনটায় প্লেন; বাংলাদেশ বিমান। বলা তো যায় না, আমার যা কপাল প্লেন যদি আগে-ভাগে চলে আসে এই ভয়ে রাত ন'টা থেকে এয়ারপোর্টে বসে আছি। সঙ্গে টাকা-পয়সা যা ছিল সব শেষ মুহূর্তের বাজারে শেষ করা গেল। এখন বিমানের জন্যে অপেক্ষা। যথাসময়ে ইংল্যান্ড থেকে বিমান এলো। বোর্ডিং পাস নিতে গেছি। বাংলাদেশ বিমানের লোকজন বলল, এথেন্স থেকে প্লেন ওভার বুকিং হয়ে এসেছে, আপনাকে নেয়া যাবে না। আমি আঁৎকে উঠে বললাম, সে কি, চব্বিশ ঘণ্টা আগেই তো টিকিট ওকে করানো।

"বললাম তো যাত্রী বোঝাই। কিচ্ছু করা যাবে না।"

প্লেন আমাকে রেখে চলে গেল। শীতের রাত। সঙ্গে একটা পয়সা নেই। এখানে কাউকে চিনিও না। চিৎকার করে কাঁদতে ইচ্ছা হচ্ছে.....

এইসব তো ছোটখাটো বিপদ, ইংল্যান্ডের হিথ্রো বিমানবন্দরে একবার মহাবিপদে পড়েছিলাম। দুই কন্যা এবং স্ত্রীকে নিয়ে আমেরিকা থেকে দেশে ফিরছি। পাসপোর্ট যাতে নিরাপদে থাকে সেই জন্যে গুলতেকিনের হ্যান্ডব্যাগে

রাখা আছে। [গুলতেকিন, আমার স্ত্রীর নাম। এই ভয়াবহ নাম তার দাদা রেখে গেছেন। বিয়ের পর বদলাতে চেয়েছিলাম, পারি নি।]

লন্ডনে ছ'ঘন্টার যাত্রাবিরতি। আমি মহানন্দে সিগারেট টানছি। গুলতেকিন বলল, মুখের সামনে সিগারেট টানবে না তো। বমি আসছে। অন্য কোথাও গিয়ে সিগারেট শেষ করে আসো। আমি বিমর্ষ মুখে উঠে গেলাম। এদিক-ওদিক ঘুরছি। এই উদ্দেশ্যহীন ঘুরাই আমার কাল হলো এক সময় দেখি– আমি এয়ারপোর্টের বাইরে। ভেতরে ঢুকতে গেলাম আরতো ঢুকতে পারি না, যতই বলি– আমি একজন ট্রানজিট প্যাসেঞ্জার ভুল করে বাইরে চলে এসেছি, ততই তাদের মুখ অন্ধকার হয়। আমাকে নিয়ে গেল পুলিশের কাছে, মৈনাক পর্বতের মতো সাইজ। কথা বলছে না তো মেঘ গর্জন করছে।

"তুমি বলছ, তুমি ট্রানজিট প্যাসেঞ্জার?"

আমি বিনয়ে গলে গেলাম। এই বিপদ থেকে উদ্ধারের একমাত্র উপায় হচ্ছে বিনয়। আমি মধুর গলায় বললাম, ইয়েস স্যার।

"দেখি তোমার পাসপোর্ট।"

"পাসপোর্ট আমার সঙ্গে নেই।"

"বিনা পাসপোর্টে তুমি সিকিউরিটি এলাকা অতিক্রম করে বের হলে কি করে?"

"আমি জানি না স্যার। হাঁটতে হাঁটতে কি করে যেন চলে এসেছি।"

"তোমার দেশ কোথায়?"

"বাংলাদেশ।"

"ও আই সি।"

এমন ভাবে "ও আই সি" বলল যাতে মনে হতে পারে পৃথিবীর সব ভয়াবহ ক্রিমিনালদের জন্মভূমি হচ্ছে বাংলাদেশ। আমি গলায় মধুর পরিমাণ আরো বাড়িয়ে দিয়ে বললাম, আপনি যদি আমাকে ট্রানজিট এরিয়াতে নিয়ে যান তাহলেই আপনার সব সন্দেহের অবসান হবে। আমার স্ত্রী দুই মেয়ে নিয়ে সেখানে আছে। তার হ্যান্ডব্যাগে আমার পাসপোর্ট।

"এসো তুমি আমার সঙ্গে।"

আমি অত্যন্ত উৎসাহের সঙ্গে রওনা হলাম। মনে হলো বিপদ কেটেছে। কিন্তু না বিপদ কাটবে কোথায়, বিপদের সবে শুরু। সে আমাকে ছোট একটা ঘরে ঢুকিয়ে বাইরে থেকে দরজা লাগিয়ে দিল। হতভম্ব হয়ে লক্ষ করলাম এটা একটা হাজত। ব্যাটা ফাজিল, আমাকে হাজতে ঢুকিয়ে দিয়েছে।

পাঠক-পাঠিকারা নিশ্চয়ই এতক্ষণে আমার বিদেশভীতির উৎস ধরে ফেলেছেন। আমার এই বিদেশাতংকের কারণেই ইউ. এস. আই. এস.-এর অনেক কর্মকর্তা যখন টেলিফোন করে বললেন, আপনি কি কিছুদিনের জন্যে আমেরিকা বেড়াতে যেতে আগ্রহী?

আমি খুবই বিনয়ের সঙ্গে বললাম, জি না।

"কেন বলুন তো?"

"আমি ঐ দেশে ছ'বছর থেকে এসেছি।"

"সে তো অনেক দিন আগের কথা। এখন যান আপনার ভালো লাগবে। পৃথিবীর নানান জায়গা থেকে লেখকরা আসছেন। আমরা চাচ্ছি বাংলাদেশ থেকে আপনি যান।"

"কত দিনের ব্যাপার?"

"অল্পদিন– এক মাস।"

"এক মাস হলে ভেবে দেখি।"

"ভাবাভাবির কিছু নেই। আমরা ব্যবস্থা করছি– আপনার নাম পাঠিয়ে দিচ্ছি। পরে আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করব।"

তাঁরা যথাসময়ে যোগাযোগ করলেন এবং অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে জানালেন– প্রোগ্রামে সামান্য পরিবর্তন হয়েছে– এক মাস নয় থাকতে হবে প্রায় তিনমাস।

আমার মাথায় আকাশ ভেঙ্গে পড়ল। তিন মাস কি করে থাকব?

আমার বিদেশ যাত্রার সংবাদে কয়েকজনকে খুব উল্লসিত মনে হলো। তাদের অন্যতম আমার কনিষ্ঠ কন্যা বিপাশা। সে ঘোষণা করল, আমিও বাবার সঙ্গে যাব। আমার জন্যে টিকিট কাটার দরকার নেই। আমি বাবার কোলে বসেই যেতে পারব।

সে তার ছোট স্যুটকেস অতি দ্রুত গুছিয়ে ফেলল; টুথব্রাশ, সাবান, তোয়ালে। তার কাণ্ড দেখে অন্যরা হাসছে কিন্তু কষ্টে আমার কান্না পাচ্ছে– কি করে এদের ছেড়ে থাকব? কি করে কাটবে প্রবাসের দীর্ঘ দিবস, দীর্ঘ রজনী?

আমার প্রকাশকদের একজন কাকলী প্রকাশনীর সেলিম সাহেবকেও আমার বিদেশ যাত্রায় খুব আনন্দিত মনে হলো। তিনি দুই ভাঁড় দৈ নিয়ে উপস্থিত হলেন। কোনোরকম আনন্দের ব্যাপার হলেই তিনি তাঁর দেশের বাড়ির মোষের টক দৈ নিয়ে উপস্থিত হন। অতি অখাদ্য সেই দৈ দেখলেই হৃৎকম্প হয়, তবু ভদ্রতা করে বলি– অসাধারণ।

সেলিম সাহেব দৈ-এর ভাঁড় রাখতে রাখতে হাসি মুখে বললেন, স্যার শুনলাম আপনি আমেরিকা যাচ্ছেন। শুনে বড় ভালো লাগছে।

আমি বিস্মিত হয়ে বললাম, ভালো লাগছে কেন বলুন তো?

সেলিম সাহেব লাজুক ভঙ্গিতে বললেন, ফিরে এসে হোটেল গ্রেভার ইনের মতো একটা বই লিখে ফেলবেন। আমি ছাপব।

আমি তাঁর আনন্দের কারণ এতক্ষণে বুঝলাম, আমেরিকান অভিজ্ঞতা নিয়ে হোটেল গ্রেভার ইন নামে কিছু স্কেচধর্মী লেখা লিখেছিলাম। সেই বই পাঠকরা আগ্রহ নিয়ে পড়েছে। এবং সেলিম সাহেব হচ্ছেন বইটির প্রকাশক।

"স্যার আপনি যাওয়ার আগে আগে আরো দৈ দিয়ে যাব। আমার ছোট ভাইকে দেশে পাঠিয়েছি ও নিয়ে আসবে।"

"থ্যাংকস।"

"অনেকেই এই দৈ পছন্দ করে না। একমাত্র আপনাকেই দেখলাম আগ্রহ করে খান। ভালো জিনিসের মর্যাদা খুব কম মানুষই বোঝে।"

আমি শুকনো গলায় বললাম, 'খুবই খাঁটি কথা।'

"বই-এর নামটা কি দিয়ে যাবেন? নাম দিয়ে গেলে কভার করে রাখতাম।"

"বইটির নাম হোটেল মে ফ্লাওয়ার।"

"হোটেল মে ফ্লাওয়ার?"

'হ্যাঁ, যে ডরমিটরিতে থাকব তার নাম মে ফ্লাওয়ার..."

"আর বলতে হবে না বুঝতে পেরেছি– তাহলে কভার করে ফেলি?"

"করে ফেলুন। আরেকটা কথা সেলিম সাহেব, ঐ দৈটা না আনলে হয় না?"

বাঙালির বিদেশ যাত্রার প্রথম প্রস্তুতি হচ্ছে স্যুটকেস ধার করা। নিজেদের যত ভালো স্যুটকেসই থাকুক বিদেশ যাত্রার আগে অন্যের কাছে স্যুটকেস ধার করতে হবে। এটাই নিয়ম।

গুলতেকিন অবশ্যি নিয়মের ব্যতিক্রম করল– স্যুটকেস কিনে আনল। হুলস্থূল ধরনের বিশাল এক বস্তু। আমি চোখ কপালে তুলে বললাম, এটা কি?

সে বিরক্ত হয়ে বলল, সব সময় রসিকতা ভালো লাগে না। একটু বড় সাইজ কিনেছি তাতে হয়েছে কি! স্যুটকেস হলো ঘড়ির মতো, যত ছোট তত দাম বেশি। বেশি দাম দিয়ে ছোট জিনিস কেন কিনব?

"কিছু মনে করো না গুলতেকিন, এই বস্তু এরোপ্লেনের দরজা দিয়ে ঢুকবে না। দরজা কেটে ঢুকাতে হবে।"

"দরজা কেটে ঢুকাতে হলে দরজা কেটে ঢুকাবে। আর এই নাও তোমার হ্যান্ডব্যাগ।"

হ্যান্ডব্যাগ দেখেও আমি চমৎকৃত হলাম। সেই হ্যান্ডব্যাগে নানান জায়গায় গোটা ত্রিশেক পকেট। আমি বিস্ময় মাখা গলায় বললাম, অদ্ভুত অদ্ভুত সব জিনিস তোমার চোখে পড়ে। এইটা তাহলে হ্যান্ডব্যাগ? ধরব কোথায়? হাতল বা কাঁধে ঝুলাবার ফিতা কোনোটাই তো দেখছি না।

দেখা গেল ঐ হ্যান্ডবাগে হাতে নেবার বা কাঁধে ঝুলাবার ব্যবস্থা নেই। বগলে নিয়ে ঘুরতে হবে। তাই সই।

যথাসময়ে হ্যান্ডব্যাগ বগলে নিয়ে এবং পর্বতপ্রমাণ স্যুটকেস টানতে টানতে এয়ারপোর্টে উপস্থিত হলাম। যিনি বোর্ডিং কার্ড দেন তিনি বিস্ময়ে আপ্লুত হয়ে বললেন, এই স্যুটকেস আপনার? কোত্থেকে কিনেছেন বলুন তো?

বিমান আকাশে উড়ল এবং এক সময় বিমানবালার গলায় শুনতে পেলাম–তীস্ হাজার ফুট উছতায়– অর্থাৎ আমরা ত্রিশ হাজার ফুট উচ্চতায় ভ্রমণ করছি। বাংলাদেশ বিমান এই অদ্ভুত উচ্চারণের বাংলা কোত্থেকে জোগাড় করেছে কে জানে। বাংলা একাডেমীর প্রাক্তন মহাপরিচালক মরহুম আবু হেনা মোস্তফা কামালের এই বিষয়ে একটি থিওরি আছে। তিনি মনে করেন এই উচ্চারণ ওরা পেয়েছে পাকিস্তানিদের কাছ থেকে। এক সময় পি.আই.এর কোনো বাঙালি বিমানবালা ছিল না। উর্দুভাষী বিমানবালারা অনেক কষ্টে এইভাবে বাংলা বলত। সেই থেকে এটাই হয়ে গেল বিমানের স্টান্ডার্ড বাংলা উচ্চারণ। পাকিস্তানি ভূত এত সহজে ঘাড় থেকে নামবার নয়। এখনকার বাঙালি বিমানবালারা অনেক কষ্টে উর্দু উচ্চারণে বাংলা রপ্ত করে। এই উচ্চারণ এদের অনেক ত্যাগ এবং তিতিক্ষায় শিখতে হয়। ওদের ট্রেনিং-এর এটাই সবচে' শক্ত পার্ট।

হিথ্রো বিমানবন্দরে পৌঁছলাম ভোরবেলা। বিমান থেকে নেমে ট্রানজিট লাউঞ্জে যাবার আগেই বিপদে পড়ে গেলাম। বিপদে পড়ব জানা কথা, এত আগে পড়ব বুঝতে পারিনি। সম্ভবত আমাকে ড্রাগ ডিলারদের মতো দেখাচ্ছিল। জনৈক মেয়ে পুলিশ এগিয়ে এসে নিখুঁত ভদ্রতায় বলল, তুমি কি আমার সঙ্গে একটু আসবে?

আমি গেলাম তার সঙ্গে।

"তোমার বগলের এই ব্যাগে কি আছে?"

"আমি জানি না কি আছে।"

"তোমার ব্যাগ অথচ তুমি জানো না?"

"আমার স্ত্রী ব্যাগ গুছিয়ে দিয়েছে। কাজেই আমি জানি না কি আছে।"

"ব্যাগ খুলো।"

খুললাম। প্রথম যে জিনিস বের হয়ে এলো তা হচ্ছে গোটা পঞ্চাশেক প্যারাসিটামল ট্যাবলেট। আমার দীর্ঘদিনের সহচর– মাথাব্যথাকে বশে রাখার জন্যে তিন মাসের সাপ্লাই। মহিলা পুলিশের চোখে-মুখে আনন্দের ঝিলিক খেলে গেল। এই ঝিলিকের অর্থ হলো–"পাওয়া গেছে। পাওয়া গেছে।"

"তুমি কি দয়া করে ব্যাখ্যা করবে এগুলি কি?"

"এগুলি হচ্ছে মাথা ধরার অষুধ। কমার্শিয়াল নেম প্যারাসিটামল। এক ধরনের এনালজেসিক। ক্যামিকেল কম্পোজিশন এসিটামিনোফেন।"

"এগুলি তুমি কোথায় নিয়ে যাচ্ছ?"

"আমেরিকায়।"

"আমেরিকায় কি এ ধরনের অষুধ পাওয়া যায় না?"

"পাওয়া যায় নিশ্চয়ই, তবু নিয়ে যাচ্ছি।"

"কি করবে?"

"খাব।"

"দেখি তোমার পাসপোর্ট।"

দিলাম পাসপোর্ট। সে অতি মনোযোগে পাতা উল্টে দেখতে লাগল। যেন এটা জাল পাসপোর্ট। দেখা গেল আমার মতো আরো দুর্ভাগা আছে। সিলিটে এক পরিবার ধরা খেয়েছে। বাবা-মা এবং ছ'টি নানান সাইজের ছেলেমেয়ে। এদের একজনের হাতে পলিথিনের কাগজে মোড়া বিশাল আকৃতির দুটি মানকচু। পরিবারের কর্তা করুণ গলায় ক্রমাগত বলছে– আই ব্রিটিশ, ফ্যামিলি ব্রিটিশ। অল চিলড্রেন বর্ন ব্রিটিশ। আই ব্রিটিশ কান্ট্রি লিভ থার্টি ইয়ার।–

যে পুলিশ অফিসার ওদের নিয়ে এসেছে সে এইসব কথাবার্তায় মোটেই কান দিচ্ছে না। সে সবার হাত থেকে পাসপোর্ট নিয়ে নির্বিকার ভঙ্গিতে অন্য একটা ঘরে ঢুকে পড়ল। পরিবারের কর্তা আমাকে বললেন, ওরা আফনারে দরল কি কারণ?

আমি বললাম, এখনো বুঝতে পারছি না।

"ভাইছাব, মনে মনে দুয়া ইউনুস পড়েন। এরা বড় হারামি জাত।"

আমি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেললাম।

দরিদ্র দেশে জন্মগ্রহণের অনেক যন্ত্রণা।

মাঝরাতে আমেরিকার আইওয়া স্টেটের ছোট্ট শহর সিডার রেডিস-এ বিমান থামল। প্রায় দশ বছর পর এই দেশে আসছি। চারদিকে তাকাচ্ছি। কিন্তু দশ বছরে কি পরিবর্তন হলো তা দেখার তেমন আগ্রহ বোধ করছি না। আমেরিকা কতটুকু বদলালো তা দিয়ে আমার কি? আমার দেশে দশ বছরে কিছুই হয় নি এই আমার চিন্তা। চারদিকে তাকানোর উদ্দেশ্য– দেখা কেউ আমাকে নিতে এলো কি না। না এলে খুব চিন্তার কথা। অচেনা শহরে ট্যাক্সি ভাড়া করে হোটেলে উঠতে হবে। তাও দুপুর রাতে। পকেটে একশ' ডলারের একটা নোট, তা দিয়ে ট্যাক্সি ভাড়া এবং হোটেল ভাড়া হবে কি-না কে জানে। কাউকে দেখতে পেলাম না। এটাই স্বাভাবিক। আজ উইক এন্ডের রাত। আমেরিকানরা হৈচৈ করে ছুটি কাটাচ্ছে। কার দায় পড়েছে মাঝরাতে এয়ারপোর্টে এসে বসে থাকার?

আমি পুরো পরিস্থিতি ঠাণ্ডা মাথায় চিন্তা করার জন্যে ভেন্ডিং মেশিন থেকে গরম কফি কিনলাম। সিগারেট ধরাব কি না বুঝতে পারছি না। সিগারেট খাওয়া এখানে ড্রাগ খাওয়ার মতো হয়ে গেছে। সব জায়গায় নো স্মোকিং। সিগারেট ধরালেও সমস্যা– চারদিক এত ঝকঝক-তকতকে ছাই ফেলব কোথায়? যেখানে সেখানে ছাই ফেলার এবং ওয়াক থু বলে থুথু ফেলার যে মজা তা এরা কোনোদিন জানবে না।

"কিছু মনে করবে না। তুমি কি বাংলাদেশের লেখক ড. হুমায়ূন?"

আমি চমকে তাকালাম।

ইন্ডিয়ান-আমেরিকানদের মতো দেখতে বিশাল দেহী এক যুবক দাঁড়িয়ে। মাথায় টেক্সানদের হ্যাট। মুখ হাসি হাসি। আমি হাসি মুখে মাথা নাড়লাম।

"আমার নাম লেম। আমি আন্তর্জাতিক লেখক সম্মেলনের সঙ্গে জড়িত। আমি তোমাকে নিতে এসেছি।"

"ধন্যবাদ। মনে হচ্ছে আমি তোমার উইক এন্ড মাটি করেছি।"

"তা করেছ। আমি অনেকক্ষণ থেকেই তোমাকে লক্ষ করছি। তুমি যে লেখক বুঝতে পারি নি। তোমার চেহারা লেখকদের মতো নয়।"

"লেখকদের চেহারা কেমন থাকে বলো তো?"

লেম হাসতে হাসতে বলল, "তাও তো জানি না। তোমার লাগেজ কোথায়?"

আমি আমার স্যুটকেস দেখিয়ে দিলাম। লেম বিস্ময় মাখা গলায় বলল, "হলি কাউ! এটা স্যুটকেস?"

"হ্যাঁ।"

"আমি ছোট গাড়ি নিয়ে এসেছি। এই জিনিস গাড়িতে ঢুকবে না। এটা বরং এখানে থাক। ভোরে বড় গাড়ি করে নিয়ে যাব।"

"বেশ তো, তাই করো।"

"আমরা যাব আইওয়া সিটিতে। তোমাকে তোমার আস্তানায় নামিয়ে দিয়ে চলে যাব। ভোরবেলা আবার এসে অন্যান্য লেখকদের সঙ্গে তোমাকে পরিচয় করিয়ে দেব।"

"ধন্যবাদ।"

"তুমি কি বাংলায় লেখালেখি করো?"

"হ্যাঁ।"

"বাংলায় লেখালেখি করেন এমন লেখক এই প্রোগ্রামে খুব বেশি আসেননি। একজন শুধু এসেছিলেন, দু'বার এসেছিলেন।"

"তাঁর নাম কি?"

"সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়। তুমি কি তাঁকে চেনো?"

"খানিকটা চিনি তবে তাঁর লেখার সঙ্গে পরিচিত।"

আমরা গাড়িতে উঠলাম। লেম বলল, "দয়া করে সিট বেল্ট বেঁধে নাও। আইওয়া রাজ্যে সিট বেল্ট না বাঁধলে সঙ্গে সঙ্গে ড্রাইভারের জরিমানা।"

আমি সিট বেল্ট বাঁধলাম। গাড়ি ঝড়ের গতিতে উড়ে চলল। বিশ্ববিখ্যাত আমেরিকান হাইওয়ে। এই হাইওয়েতে গুলতেকিন এবং আমার বড় মেয়ে নোভাকে নিয়ে কত না ঘুরা ঘুরেছি। এক শীতের রাতে ক্রমাগত গাড়ি চালানোর রেকর্ড করব ভেবে সারারাত গাড়ি চালিয়েছিলাম। এক মুহূর্তের জন্যেও না থেমে ফার্গো থেকে গিয়েছিলাম মন্টানার বনভূমিতে।

আমি পুরানো আমেরিকা দেখার চেষ্টা করছি। কুয়াশা পড়েছে। তেমন কিছু দেখা যাচ্ছে না। গাছপালা বা পাহাড়-পর্বত চোখে পড়ছে না। মনে হচ্ছে প্রেইরির সমভূমি।

"লেম!"

"ইয়েস প্লিজ।"

"তোমাদের এটা কি সমভূমি? ফ্ল্যাট ল্যান্ড?"

"না। এটাকে বলে রোলিং কান্ট্রি। ঢেউ-এর মতো উঁচু নিচু। আইওয়া হচ্ছে–পৃথিবীর সেরা কর্ন প্রডিউসিং এলাকা।"

শেম গাড়ির রেডিও চালু করে দিল। ভুলেই গিয়েছিলাম রাতের বেলা হাইওয়েতে গাড়ি নিয়ে নামলে এরা অবশ্যই রেডিও চালু রাখে। যাতে চলন্ত গাড়িতে ঘুমিয়ে না পড়ে। চোখ এবং কান থাকে সজাগ। রেডিওতে একটি মেয়ে অত্যন্ত মিষ্টি গলায় গাইছে–

"I will love you on Tuesday."

মেয়েটি তার প্রেমিককে শুধু মঙ্গলবারে ভালোবাসতে চায় কেন? সপ্তাহের অন্যদিনগুলি কি দোষ করল? এই ভাবতে ভাবতে ঝিমুনী ধরে গেল।

"হুমায়ূন। নামো আমরা এসে গেছি।"

চোখ কচলাতে কচলাতে গাড়ি থেকে নামলাম। আধো অন্ধকার, আধো ছায়ায় মেপল এবং বার্চ গাছে ঢাকা বিশাল লাল ইটের দোতলা দালানের সামনে গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। হুহু করে বইছে শীতের হাওয়া। বিকট শব্দে ঝিঁ ঝিঁ পোকা ডাকছে। আমেরিকান ঝিঁ ঝিঁ পোকা বড় বেশি শব্দ করে। আমি হতভম্ব হয়ে বললাম, এইখানে থাকব?

"হুঁ।"

"আমি একা?"

"হ্যাঁ।"

"সে কি–আমাকে তো বলা হয়েছিল যে ফ্লাওয়ারের কথা।"

"তুমি দেরি করে এসেছ তাই যে ফ্লাওয়ার তোমাকে দেয়া যায় নি। আমরা তোমার জন্যে এই বাড়ি ভাড়া করেছি। বাড়ি তোমার পছন্দ হবে। দেড়শ' বছরের পুরানো বাড়ি। এক সময় স্কুল হাউস ছিল। ছোট ছোট বাচ্চারা পড়ত। তুমি শুনে খুশি হবে এই বাড়ি হিস্টোরিক্যাল প্রিজার্ভেশন পুরস্কার পেয়েছে। আমরা অনেক খুঁজে পেতে এই বাড়ি বের করেছি।"

আমি শুকনো গলায় বললাম, "থ্যাংকস। কিন্তু বাড়িতে ঢুকে আমার কাঁপুনি ধরে গেল। এই নির্জনপুরীতে একা থাকব কি করে? ভয়েই তো মারা যাব। ভূত প্রেত আছে কি-না কে জানে। পুরানো বাড়ি ভূতদের খুব প্রিয় হয় বলে জানি।"

"হুমায়ূন বাড়ি পছন্দ হয়েছে তো?"

"হয়েছে। কিন্তু কথা হলো– ভূত-প্রেত নেই তো?"

লেম কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল, "থাকতেও পারে। পুরানো বাড়ি বুঝতেই পারছ। গুড নাইট, স্লিপ টাইট।"

স্লিপ টাইট মানে? ভয়ে আমার আত্মা শুকিয়ে গেল। ঘুমুতে গেলাম ঘরের সব ক'টা বাতি জ্বালিয়ে। বলাই বাহুল্য ঘুম এলো না। আমার তিন কন্যা এবং কন্যাদের মা'র জন্য বড্ড মন কেমন করতে লাগল। কেন বোকার মতো ওদের ছেড়ে এসেছি। কি আছে এখানে? একা একা এই ভুতুড়ে বাড়িতে নিশিযাপনের কোনো মানে হয়?"

শেষ রাতের দিকে মনে হলো কাঠের মেঝেতে পা টেনে টেনে কে যেন হাঁটছে। ক্যাঁচ ক্যাঁচ শব্দ হচ্ছে– কেউ বোধ হয় বাথরুমের দরজা খুলে বের হচ্ছে সেখান থেকে। পরিষ্কার নিঃশ্বাস ফেলার শব্দ পেলাম। আমি ভয়ে আধমরা হয়ে কাঁপা কাঁপা গলায় বললাম– Who is there? ইংরেজিতে বললাম কারণ আমেরিকান ভূত বাংলা নাও বুঝতে পারে। প্রশ্ন করে আরো ভয় পেয়ে গেলাম কারণ ভূত যদি সত্যি সত্যি প্রশ্নের উত্তর দেয় তাহলে হার্টফেল করে মরে যাওয়া ছাড়া কোনো পথ নেই। মেঝেতে হেঁটে আসার শব্দ। আমার শোবার ঘরের দিকে এগিয়ে আসছে। আমি নিশ্চিত এখন কেউ কোমল গলায় বলবে– হে বিদেশী আমি এখানে বড়ই নিঃসঙ্গ। আমি খানিকক্ষণ তোমার সঙ্গে এই জীবনের হতাশা ও বেদনা নিয়ে কথা বলতে চাই। তুমি কি দয়া করে বাতি নিভিয়ে দেবে?

তেমন কিছু হলো না। পদশব্দ দরজার কাছে থেমে গেল। ঘুমানোর চেষ্টা করা বৃথা। আমি হাত বাড়িয়ে কবিতার বই টেনে নিলাম। কবিতা পড়ে যদি ভূতের ভয় কাটানো যায়। হিথ্রো বিমানবন্দরে এক গাদা বই কিনেছি। তার মধ্যে পণ্ডিত নেহেরুর প্রিয় কবি রবার্ট ফ্রস্ট আছেন। যার 'Stopping by woods on a snowing evening' কবিতার প্রতি ভারতবাসীর দৃষ্টি তিনিই প্রথম আকৃষ্ট করেন।

কবিতা আমার প্রিয় বিষয় নয় তবু এই ভয়ংকর রাতে কবিতাই আমাকে উদ্ধার করল। পড়তে পড়তে ভূতের ভয় কেটে গেল।

"The woods are lovely dark and deep
But I have promises to keep
And miles to go before I sleep
And miles to go before I sleep."

পৃথিবীর নানান জায়গা থেকে পঁয়তাল্লিশ জন লেখক একত্র হয়েছেন। সবাই পরিণত বয়স্ক। অনেকেরই চুল-দাড়ি ধবধবে সাদা। নিজেকে এদের মধ্যে খুবই অল্প বয়স্ক লাগছিল। যদিও ভালো করেই জানি মেঘে মেঘে অনেক বেলা হয়েছে। উনিশ বছরের যুক্তিহীন আবেগময় যৌবন পেছনে ফেলে এসেছি অনেক অনেক আগে।

লেখকদের কাউকেই চিনি না। কারো কোনো বইও আগে পড়ি নি। তবে ভাবভঙ্গিতে যা বুঝলাম যাঁরা এসেছেন সবাই তাঁদের দেশের অতি সম্মানিত লেখক। সবার লেখাই একাধিক বিদেশী ভাষায় অনুবাদ হয়েছে। প্রোগ্রামটির পরিচালক প্রফেসর ক্লার্ক ব্লেইস নিজেও আমেরিকার নাম করা ঔপন্যাসিকদের একজন। তাঁর একটি উপন্যাসের ওপর ভিত্তি করে আমেরিকার একটি বড় ফ্লিম কোম্পানি এই মুহূর্তে ছবি তৈরি করছে।

প্রফেসর ক্লার্ক বুড়ো মানুষ। ধবধবে শাদা দাড়ি— ঋষি ঋষি চেহারা। এক পর্যায়ে তিনি আমার কাছে এগিয়ে এসে আমাকে চমকে দিয়ে পরিষ্কার বাংলায় বললেন, কেমন আছ হুমায়ূন?

উত্তর দেব কি, হতভম্ব হয়ে তাকিয়ে আছি। প্রফেসর ক্লার্ক আমার বিস্ময় খুব উপভোগ করলেন বলে মনে হলো। আমি কিছু বলার আগেই আমাকে আরো চমকে দিয়ে বললেন, "আমি সম্পর্কে তোমাদের জামাই হই।"

এর মানে কি? কি বলছেন উনি? আমাকে বেশিক্ষণ হতচকিত অবস্থায় থাকতে হলো না। প্রফেসর ক্লার্ক তাঁর বক্তব্য ব্যাখ্যা করলেন। ইংরেজিতে বললেন, আমি একটি বাঙালি মেয়ে বিয়ে করেছি, কাজেই আমি তোমাদের জামাই। আমার স্ত্রীর নাম ভারতী মুখোপাধ্যায়। কোলকাতার মেয়ে।

"বলো কি?"

"খুব অবাক হয়েছ?"

"তা হয়েছি।"

"বাংলাদেশের কোন জায়গায় তোমার জন্ম?"

"ময়মনসিংহ।"

"ভারতীর দেশও ময়মনসিংহ– মজার ব্যাপার না?"

"হ্যাঁ খুবই মজার ব্যাপার।"

"তোমার সঙ্গে আমার আরো কিছু মিল আছে। কাগজপত্র ঘেঁটে দেখলাম তুমি Ph.D করেছ নর্থ ডেকোটা থেকে। আমার জন্মও নর্থ ডেকোটায়। এসো আমরা কফি খেতে খেতে গল্প করি।"

কফির মগ হাতে তিনি দল ছেড়ে বাইরে গেলেন, আমি গেলাম তাঁর পেছনে পেছনে। তিনি গলার স্বর নামিয়ে বললেন, ওয়াশিংটন থেকে টেলেক্স করে তোমার পারিবারিক দুর্ঘটনার খবর আমাকে জানিয়েছে। আমি খুবই দুঃখিত। তবু তুমি যে এসেছ এতেও আনন্দ পাচ্ছি। বাংলাদেশ থেকে এই প্রথম ইন্টারন্যাশনাল রাইটিং প্রোগ্রামে কাউকে পেলাম।

"আগে আর কেউ আসেন নি?"

"না। তবে তোমাদের কবি জসীমুদ্দিনের মেয়ে হাসনা ছিল। সে অবশ্য রাইটিং প্রোগ্রামে ছিল না। সে ছিল আইওয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী। তুমি কি তাকে চেনো?"

"না আমি চিনি না। আমার চেনাজানার গণ্ডি খুবই সীমিত।"

"ভারতীর সঙ্গে আমি তোমার পরিচয় করিয়ে দেব। ও এখন আছে ক্যালিফোর্নিয়ায়। সেও অধ্যাপনা করে। ভারতী এলে তোমাকে দেখিয়ে দেবে কোন গ্রোসারিতে হলুদ, মরিচ, ধনিয়া পাওয়া যায়। ও সব জানে।"

"ধন্যবাদ প্রফেসর ব্রেইস।"

"তুমি তো অনেক দিন পর এ দেশে এলে, কেমন লাগছে?"

"এখনো বুঝতে পারছি না।"

"খুব শীত পড়বে কিন্তু। গরম কাপড় কিনে নিও। কোনোরকম অসুবিধা হলে আমাকে জানিও। আমি জানি বাঙালিরা মুখচোরা ধরনের হয়। আমেরিকায় যতক্ষণ থাকবে ততক্ষণ আমেরিকানদের মতোই থাকবে।"

আমরা লেখদের দলে ফিরে এলাম। লেখকদের মধ্যে একজন শাড়ি পরা মহিলা। সম্ভবত ভারতের কবি গগন গিল। এগিয়ে গেলাম– না গগন গিল নন ইনি শ্রীলংকার কবি জেন, উনি সঙ্গে তাঁর স্বামীকে নিয়ে এসেছেন। স্বামী বেচারাকে মনে হলো স্ত্রীর প্রতিভায় মুগ্ধ। হাঁ করে সারাক্ষণ স্ত্রীর মুখের দিকে তাকিয়ে আছেন। কবি জেন-এর কথা বলা রোগ আছে। মনে হয় অনেকক্ষণ কথা বলার কাউকে পাচ্ছিলেন না, আমাকে পেয়ে আনন্দে উচ্ছ্বসিত হলেন। কাঁধে ঝুলানো ব্যাগ খুলে এক তাড়া কাগজ বের করে বললেন আমি 'গোয়া' নিয়ে একটি কবিতা

লিখেছি। এসো তোমাকে পড়ে শোনাই। শুনতে আপত্তি নেই তো?

প্রথম আলাপেই অভদ্র হওয়া যায় না, আমি হ্যাঁ সূচক মাথা নাড়লাম। ভদ্রমহিলা সঙ্গে সঙ্গে আবৃত্তি শুরু করলেন ইংরেজি কবিতা। সেই কবিতাও মহাভারতের সাইজের, শেষ হতে চায় না। দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে আমার পায়ে ঝিঁ ঝিঁ ধরে গেল। এ কি বিপদে পড়লাম। চোখে-মুখে আগ্রহের ভাব ধরে রাখতে হচ্ছে। যাতে আমাকে দেখে মনে হয় কবিতার প্রতিটি শব্দ আমাকে অভিভূত করছে। এ বড় কঠিন অভিনয়। এক সময় কাব্য পাঠ শেষ হলো। জেন উজ্জ্বল মুখে বললেন,

"কেমন লাগল বলো তো?"

"অসাধারণ।"

"থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ। তোমার কি ধারণা কবিতাটা একটু অদ্ভুত?"

"কিছুটা অদ্ভুত তো বটেই।"

"সবাই তাই বলে। জানো, আমি সহজ করে লিখতে চাই কিন্তু মাঝামাঝি এসে সুররিয়েলিস্টিক হয়ে যায়। মনে হয় অন্য কেউ যেন আমার মাঝে কাজ করে। সে আমাকে দিয়ে কিছু লিখিয়ে নেয়।"

ভদ্রমহিলার স্বামী বললেন, "ওগো তুমি হুমায়ূনকে ঐ কবিতাটা শোনাও–ঐ যে কার্ফ্যুর রাতে তুমি রাস্তায় হাঁটছিলে।"

জেন সঙ্গে সঙ্গে দ্বিতীয় কবিতা বের করলেন। আয়তনে সেটি প্রথমটির দ্বিগুণ। দ্বিতীয় কবিতা শুনলাম তারপর তৃতীয় কবিতা শুনলাম এবং শুকনো মুখে বললাম আমি এখন একটু করিডোরে যাব। আমাকে সিগারেট খেতে হবে।

ভদ্রমহিলা এবং তার স্বামী কবিতার গোছা নিয়ে অন্য একজনের কাছে ছুটে গেলেন। আমি সিগারেট ধরিয়ে অলস ভঙ্গিতে করিডোর ধরে হাঁটছি। করিডোরের শেষ প্রান্তে বিরস মুখে দাঁড়িয়ে আছেন ইন্দোনেশীয় ঔপন্যাসিক তোহারি। আহমেদ তোহারি। ছোটখাটো মানুষ, দেখলেই স্কুলের নবম শ্রেণীর বালক বলে ভ্রম হয়। নতুন দাড়ি-গোঁফ গজানোর কারণে যে বালক বিব্রত এবং লোকচক্ষুর আড়ালে থাকার রোগ যাকে সম্প্রতি ধরেছে।

আহমেদ তোহারি তাঁর দেশে অতি জনপ্রিয়। তাঁর পাঁচটি উপন্যাস জাপানি ভাষায় অনূদিত ও সমাদৃত হয়েছে। সম্প্রতি তিনি তাঁর দেশের সবচে' বড় সাহিত্য পুরস্কারটি পেয়েছেন। বয়স ৪১, আমি নিজের পরিচয় দিতেই আনন্দিত হবার ভঙ্গি করলেন। তাঁর ইংরেজি জ্ঞান, ইয়েস এবং নো'র চেয়ে একটু বেশি তবে খুব বেশি না। নিজেকে প্রকাশ করতে তাঁর প্রচুর সময় লাগে। মনে হলো এই নিয়েও

তিনি বিব্রত। নিজেকে অন্যদের থেকে দূরে সরিয়ে রাখার এটিও একটা কারণ হতে পারে।

আহমেদ তোহারি বললেন, "তুমি কি আমাকে একটু সাহায্য করতে পারো?"

আমি বিস্মিত হয়ে বললাম, "কি সাহায্য?"

"তুমি কি একটা ভালো কম্পাস কিনে দেবার ব্যাপারে আমাকে সাহায্য করবে? কম্পাস না থাকায় নামাজ পড়তে অসুবিধা হচ্ছে। কাবার দিক ঠিক করতে পারছি না।"

"অবশ্যই কম্পাস কেনার ব্যাপারে আমি তোমাকে সাহায্য করব। তবে আমি কি তোমাকে ছোট্ট একটা প্রশ্ন করতে পারি?"

"হ্যাঁ পারো।"

"তুমি যখন জাকার্তা থেকে বিমানে করে ওয়াশিংটন এসেছ তখন তোমাকে কুড়ি ঘণ্টা বিমানে থাকতে হয়েছে। এই সময়ে কয়েকবার নামাজের সময় হয়েছে, কাবা শরীফ তখন ছিল তোমার নিচে। সেই সময় নামাজ কি ভাবে পড়েছ?"

তোহারি জবাব না দিয়ে অত্যন্ত ব্যথিত চোখে আমার দিকে তাকিয়ে রইলেন। মুসলমান হয়ে এই কথা বলব তা তিনি সম্ভবত কল্পনা করেন নি। আমারো বেশ খারাপ লাগল। এই কূটতর্কের কোনোই প্রয়োজন ছিল না।

অপরাধ বোধ থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্যে নিজেই একটা ভালো কম্পাস কিনে আনলাম। সেই রাতে লেখকদের সম্মানে ফার্স্ট ন্যাশনাল ব্যাংক বিশাল এক পার্টির আয়োজন করেছে। ফরম্যাল ডিনার। খানার চেয়ে পিনার আয়োজন বেশি। অবাক হয়ে দেখি আহমদ তোহারি রেড ওয়াইন নিয়ে বসেছেন এবং বেশ তাড়িয়ে তাড়িয়ে খাচ্ছেন। আমি তাঁর পাশে জায়গা করে বসলাম এবং মধুর স্বরে বললাম, "তুমি মদপান করছ ব্যাপারটা কি?"

তোহারি বললেন, "মদপান দোষের নয়। মওলানা জালালুদ্দিন রুমি মদপান করতেন।"

"ও আচ্ছা। আমাদের প্রফেট কিন্তু করতেন না।"

তোহারি আমার কথাবার্তা পছন্দ করলেন না। গ্লাস নিয়ে উঠে চলে গেলেন। আমার অপমানিত বোধ করার কথা কেন জানি তা করলাম না। বরং মজা লাগল।

আমার বাঁ পাশে বসেছেন চৈনিক ঔপন্যাসিক জং ইয়ং। দেখেই মনে হয় খুব হাসি-খুশি মানুষ। কথা বলতে গিয়ে দেখলাম তাঁর ইংরেজি জ্ঞান 'ইয়েসে'র মধ্যে সীমাবদ্ধ। 'ইয়েস' ছাড়া অন্য কোনো ইংরেজি শব্দ তিনি এখনো শিখে উঠতে পারেন নি বলে মনে হলো। তাঁর সঙ্গে কথাবার্তার কিছু নমুনা দেই।

"আমার নাম হুমায়ূন। আমি বাংলাদেশ থেকে এসেছি। বাংলাদেশ– তোমরা যাকে বলো মানছালা।"

"ইয়েস।" [মুখ ভর্তি হাসি। মনে হলো আমার পরিচয় পেয়ে খুব আনন্দিত।]

"তুমি কি শুধু উপন্যাসই লেখো? না কবিতাও লেখো?"

"ইয়েস।" [আবার হাসি, খুবই আন্তরিক ভঙ্গিতে।]

"আজকের পার্টি তোমার কেমন লাগছে?"

"ইয়েস। ইয়েস।" [হাসি এবং মাথা নাড়া। মনে হলো আমার সঙ্গে কথা বলে তিনি খুব আরাম পাচ্ছেন।]

ভারতীয় মহিলা কবি গগন গিলের সঙ্গে দেখা হলো এই পার্টিতেই। লেখকদের মধ্যে তিনিই সবচে' কমবয়েসি। চব্বিশ-পঁচিশের বেশি হবে না। অত্যন্ত রূপবতী। মেরুন রঙের সিল্কের শাড়িতে তাঁকে অদ্ভুত সুন্দর লাগছে। ভদ্রমহিলার হাতে মদের গ্লাস, নির্বিকার ভঙ্গিতে ভুসভুস করে সিগারেট টানছেন। শাড়ি পরা কোনো মহিলার মদ পান এবং সিগারেট টানার দৃশ্যের সঙ্গে তেমন পরিচয় নেই বলে খানিকটা অস্বস্তি লাগছে, যদিও জানি অস্বস্তি লাগার কিছুই নেই। পুরুষরা যা পারে ওরাও তা পারে ওরা বরং আরো বেশি পারে, ওরা গর্ভধারণ করতে পারে আমরা পুরষরা তা পারি না।

পার্টির শেষে আমি আহমদ তোহারিকে কম্পাসটা দিলাম। তিনি বিস্মিত হয়ে তাকিয়ে রইলেন। আমার কাছ থেকে এটা তিনি আশা করেন নি বলে মনে হলো। মানুষের বিস্মিত মুখের ছবি– বড়াই চমৎকার। আমার দেখতে খুব ভালো লাগে।

"তোহারি তোমার জন্যে আমার সামান্য উপহার। উপহারটি কাজে লাগলে আমি খুশি হব।"

লেখকরা খুব আবেগপ্রবণ হন এই কথা বোধ হয় মিথ্যা নয়, তোহারি 'মাই ডিয়ার ফ্রেন্ড' 'মাই ডিয়ার ফ্রেন্ড' বলে আমাকে জড়িয়ে ধরলেন। সবাই ভ্রূ কুঁচকে তাকিয়ে রইল, একজন পুরুষ অন্য একজন পুরুষকে জড়িয়ে ধরেছে এই দৃশ্য তাদের কাছে খুব রুচিকর নয়।

নিজের আস্তানা ভুতুড়ে বাড়িতে ফিরছি তবে ভূতের হাত থেকে রক্ষা পাবার ব্যবস্থা করে ফিরছি। স্টিফান কিং-এর একটি ভৌতিক উপন্যাস কিনে নিয়েছি। বিষে বিষক্ষয়ের মতো ভূতে ভূতক্ষয়।

বাসায় ফিরে দেখি স্টিফান কিং-এর উপন্যাস কেনার দরকার ছিল না। ফিলিপাইনের ঔপন্যাসিক রোজেলিও সিকাটকে আমার এখানে দিয়ে গেছে। তিনিও দেরিতে এসেছেন বলে মে ফ্লাওয়ারে জায়গা হয় নি।

রোজেলিও সিকাটের বয়স পঞ্চাশ তবে দেখায় তার চেয়েও বেশি। মাথায় চুল সবই সাদা। দাঁত বাঁধানো। অল্প কিছু দাড়িগোঁফ আছে। মুখের গঠন অনেকটা আর্নেস্ট হেমিংওয়ের মতো। চেইন স্মোকার।

সিকাট ইউনিভার্সিটি অব ফিলিপাইনের ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপক। নিজ দেশে তাঁর খ্যাতি তুঙ্গ স্পর্শী। তাঁকে অত্যন্ত বিরক্ত মনে হলো। আমাকে বললেন, এদের কারবারটা দেখলে? এরা আমাকে মে ফ্লাওয়ারে জায়গা দেয় নি– এই বাড়িতে নির্বাসন দিয়েছে।

"নির্বাসন বলছ কেন?"

"নির্বাসন না তো কি? সব লেখকরা দল বেঁধে মে ফ্লাওয়ারে আছেন আর আমি কি-না এখানে।"

"বাড়িটা কি তোমার পছন্দ হচ্ছে না?"

"পছন্দ হবে না কেন? পছন্দ হয়েছে। বাড়ি খুবই সুন্দর। কিন্তু প্রশ্নটা হলো নীতির। তুমি সম্ভবত জানো না এর আগে চারজন লেখককে এই বাড়িতে থাকতে বলা হয়েছিল। চারজনই অস্বীকার করেছেন।"

"তাই নাকি?"

"হ্যাঁ তাই। রোমানিয়ার কবি মির্চাকে (মির্চা কাৰ্ট্টেরেষকু) এই বাড়ি দেয়া হলে তিনি ওদের মুখের ওপর বলেছেন– এটা একটা 'Ghetto এই Ghetto-তে আমি থাকব না। আমাকে আপনারা বুখারেস্টের প্লেনে তুলে দিন।"

"তুমিও ওদের তাই বলো।"

"অবশ্যই বলব। রাগটা ঠিকমত উঠছে না। রাগ উঠলেই বলব। আমাকে দেখে মনে হয় না কিন্তু আসলে আমি খুবই রাগী মানুষ। জার্মানিতে আমি একবার মারামারি পর্যন্ত করেছি।"

"সে কি!"

"এক জার্মান যুবক আমাকে দেখে তামাশা করে কি সব বলছিল, দাঁত বের করে হাসছিল, গদাম করে তার পেটে ঘুসি বসিয়ে দিলাম। এক ঘুসিতে ঠাণ্ডা।"

আমি অবাক হয়ে ভদ্রলোকের দিকে তাকিয়ে আছি। তিনি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, এখানে অবশ্য তেমন কিছু করা যাবে না।

"করা যাবে না কেন?"

"করা যাবে না কারণ আসার আগে আমি আমার স্ত্রীর কাছে প্রতিজ্ঞা করেছি– রাগারাগি করব না। আমি আবার তাকে খুবই ভালোবাসি।"

"তাই বুঝি?"

"হ্যাঁ। সে বড়ই ভালোমেয়ে এবং রূপবতী।"

"একই সঙ্গে রূপবতী এবং ভালোমেয়ে সচরাচর হয় না– তুমি অত্যন্ত ভাগ্যবান।"

"বুঝলে হুমায়ূন, আমার স্ত্রীর এক ধরনের ইএসপি ক্ষমতা আছে। আমি যখন লেখালেখি করি তখন সে বুঝতে পারে– কখন আমি কফি চাই, কখন খাবার চাই। ঠিক সময়ে কফি উপস্থিত হয়। ঠিক সময়ে খাবার।'

"বড় চমৎকার তো!"

"একবার সে কি করল জানো? তার সমস্ত জমানো টাকা এবং গয়না বিক্রির টাকা একত্র করে ফিলিপাইনের পাহাড়ি অঞ্চলে পাহাড়ের মাথায় ছোট্ট একটা বাড়ি কিনল। যাতে ঐ বাড়িতে বসে নিরিবিলি আমি আমার লেখার কাজ চালিয়ে যেতে পারি। আমি প্রতি বছর ঐ পাহাড়ি বাড়িতে একনাগাড়ে একা একা তিন মাস থাকতাম। নিজেই রান্না করে খেতাম সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত একনাগাড়ে লিখতাম।"

"তোমার স্ত্রী তোমার সঙ্গে থাকত না?"

"ও থাকবে কি করে? ওর ঘর-সংসার আছে না? ছোট ছোট ছেলেমেয়ে। ওদের কে দেখাশোনা করবে?"

"ঐ বাড়িটি কি এখনো আছে?"

"না বিক্রি করে দিয়েছি। এক সময় খুব অভাবে পড়লাম, বিক্রি করে দিলাম। এখনো ঐ বাড়ির জন্যে আমার মন কাঁদে। অনেকক্ষণ তোমার সঙ্গে গল্প করলাম। যাই এখন কাজ করি। আমি একটা জাপানি উপন্যাস টেগালগ ভাষায় অনুবাদ করছি– Snow country কাওয়াবাতার লেখা।"

সিকাট টাইপ রাইটার নিয়ে বসলেন। তিনি টেগালগ ভাষায় লিখেন ঠিকই ব্যবহার করেন ইংরেজি টাইপ রাইটার। কারণ টেগালগ ভাষার নিজস্ব বর্ণমালা নেই। তাদের ভরসা রোমান হরফ। একই ব্যাপার তোহারির বেলাতেও। তিনিও নিজের ভাষাতে লেখেন ব্যবহার করেন ইংরেজি বর্ণমালা। অধিকাংশ আফ্রিকান দেশেই এই অবস্থা। কিছু কিছু ক্ষেত্রে সমস্যা আরো গভীর। তারা সরাসরি ইংরেজি বা ফরাসি ভাষাতেই সাহিত্য চর্চা করেন। সেনেগালের শিশু-সাহিত্যিক লিখেন ফরাসি ভাষায়, কোনো আফ্রিকান ভাষায় নয়। শ্রীলংকার কবি জেন কখনো সিংহলি বা তামিল ভাষায় লিখেননি। লিখেছেন ইংরেজিতে। নাইজেরিয়ার নোবেল পুরস্কার বিজয়ী নাট্যকার ওলে সোয়েংকা (Wole Soyinka) লেখালেখি করেন ইংরেজি ভাষায়। নিজের ভাষায় না।

বাংলা ভাষার লেখক হিসেবে আমি মহাভাগ্যবান। অন্যের ভাষায় আমাকে লিখতে হচ্ছে না, অন্যের হরফ নিয়েও আমাকে লিখতে হচ্ছে না। আমার আছে প্রিয় বর্ণমালা। এই বর্ণমালা রক্ত ও ভালোবাসা দিয়ে পৃথিবীর বুকে গেঁথে দেয়া হয়েছে।

আইওয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ফরেন স্টুডেন্ট এডভাইজারকে এখানে ক'জন বাংলাদেশী ছাত্র আছে জানতে চেয়ে এটি চিঠি লিখেছিলাম, ফরেন স্টুডেন্ট এডভাইজার দু'দিন পরে চিঠি লিখে পাঁচজন বাংলাদেশী আন্ডার গ্রাজুয়েট ছাত্রের তালিকা পাঠিয়ে দিলেন। চিঠিতে লিখলেন– মোট ছ'জন বাংলাদেশী ছাত্র পড়াশোনা করে, তোমাকে পাঁচজনের নাম এবং টেলিফোন নাম্বার পাঠানো হলো। ষষ্ঠ জনের নাম পাঠালাম না কারণ তার ব্যক্তিগত ফাইলে লেখা আছে তার সম্পর্কে কোনো তথ্য কাউকে জানানো যাবে না।

তালিকায় সবার প্রথম যার নাম তাকেই টেলিফোন করলাম। আহসান উল্লাহ আমান। আমি বাংলা ভাষায় বললাম, আমার নাম এই, আমি বাংলাদেশ থেকে এসেছি–

সে নিখুঁত আমেরিকান উচ্চারণে ইংরেজিতে বলল, আমি বাংলায় কথা বলা ভুলে গেছি– কাজেই ইংরেজিতে বলছি।

আমি হতভম্ব। বলে কি এই ছেলে তবু পুরোপুরি নিশ্চিত হবার জন্যে বললাম, বাংলায় কথা বলা ভুলে গিয়েছ?

"ইয়েস, টোটেলি ফরগটন।"

"ভুলে যাওয়া বিচিত্র কিছু না– বড়ই কঠিন ভাষা। আশা করি ভুলতে তোমাকে খুব কষ্ট করতে হয়নি।"

"অনেক দিন বাইরে আছি তো এই জন্যে ভুলে গেছি।"

"শুনে বড় ভালো লাগল।"

"আমি কি কিছু করতে পারি আপনার জন্য?"

"না। তুমি কিছু করতে পারো না। ভাবছিলাম আমি তোমার জন্যে কিছু করতে পারি কি-না। মনে হচ্ছে তাও সম্ভব নয়।"

"আপনি কি বলছেন বুঝতে পারছি না। দয়া করে ইংরেজিতে বলুন।"

"আজ থাক অন্য আরেক দিন বলব।"

টেলিফোন নামিয়ে হতভম্ব হয়ে বসে আছি– সিকাট এসে বললেন, তোমার কি হয়েছে?

"কিছু হয় নি। কিছুক্ষণ আগে একজন বাংলাদেশী ছেলের সঙ্গে কথা হয়েছে সে বলল সে বাংলা ভাষা ভুলে গেছে।"

"তুমি তার ঠিকানা জোগাড় করো। তারপর আমাকে নিয়ে চলো, আমি ঘুসি দিয়ে তার নাক ফাটিয়ে দিয়ে আসব। না না ঠাট্টা না, মারামারির ব্যাপারে আমি খুব এক্সপার্ট– জার্মানিতে কি করেছিলাম তোমাকে তো বলেছি, একেবারে হৈচৈ পড়ে গেল। এম্বেসি ধরে টানাটানি।"

আমি নানানভাবে নিজেকে বোঝানোর চেষ্টা করলাম– হয়তো এই ছেলের জন্ম হয়েছে এখানে, কোনোদিন বাংলায় কথা বলার সুযোগ হয় নি... হতেও তো পারে। বাংলাদেশের কোনো ছেলে কিছুদিন আমেরিকা বাস করে নিজের ভাষাকে অস্বীকার করবে তা হতেই পারে না।

কিংবা কে জানে হয়তো পারে। এই দেশ খুব সহজেই মানুষকে বদলে দেয়। চিন্তাভাবনাকে প্রভাবিত করে। নয়তো কেন এত এত শিক্ষিত ভদ্রঘরের চমৎকার ছেলেরা বাসন মেজে দিন পার করাতেই আনন্দ এবং জীবনের পরম লক্ষ্য খুঁজে পায়। কি আছে এ দেশে? সাজানো-গোছানো শহর, চমৎকার মল, চোখ ধাঁধানো হাইওয়ে? এই কি সব?

একটি আমেরিকান পরিবারের জীবনচর্যা চিন্তা করলে কষ্ট হয়। ওরা কি হারাচ্ছে তা বুঝতে পারে না। আমরা যারা বাইরে থেকে আসি– বুঝাতে পারি কিংবা বোঝার চেষ্টা করি।

একটি শিশুর জন্ম থেকে শুরু করা যাক।

সর্বাধুনিক একটি হাসপাতালে শিশুটির জন্ম হলো। বিশ্বের সেরা ডাক্তাররা জন্মলগ্নে শিশুটির পাশে থাকলেন। সে বাসায় ফিরল কিন্তু মায়ের কোলে ফিরল না। তার আলাদা ঘর। আলাদা খাট। কেঁদে বুক ভাসালেও মা তাকে খাবার দেবেন না। ঘড়ি ধরে খাবার দেবেন। সে বড় হতে থাকবে নিজের আলাদা ঘরে। এতে নাকি তার ব্যক্তিসত্তার বিকাশ হবে।

শিশু একটু বড় হলো। বাবা-মায়ের কাছে নয় বেশিরভাগ সময় তাকে এখন থাকতে হচ্ছে বেবি কেয়ার কিংবা বেবি সিটারদের কাছে।

তার চার-পাঁচ বছর বয়স হবা মাত্র শতকরা ৮০% ভাগ সম্ভাবনা সে দেখবে

তার বাবা-মা আলাদা হয়ে গেছেন। এই ঘটনায় তারা যেন বড় রকমের শক না পায় তার জন্যেও ব্যবস্থা করা আছে। স্কুলের পাঠ্য তালিকায় বাবা-মা আলাদা হয়ে যাবার সমস্যা উল্লেখ করা আছে।

শিশুটির বয়স বারো পার হওয়া মাত্র স্কুল থেকে তাকে জন্মনিয়ন্ত্রণের সাজসরঞ্জাম সরবরাহ করা হবে। এটি নতুন হয়েছে। যাতে যৌন রোগে আক্রান্ত না হয় সেই ব্যবস্থা। বয়োসন্ধি বয়সে যখন তারা মানসিক ও শারীরিক পরিবর্তনে হতচকিত সেই সময়টা তাদের কাটাতে হবে সঙ্গী বা সঙ্গিনীর খোঁজে যাদের পরবর্তী সময়ে বিয়ে করবে। কি ভয়াবহ সেই অনুসন্ধান। একটি মেয়েকে অসংখ্য ছেলের মধ্যে ঘুরতে হবে যাতে সে পছন্দমতো কাউকে খুঁজে পায়। সময় চলে যাবার আগেই তা করতে হবে। প্রতিযোগিতা– ভয়াবহ প্রতিযোগিতা।

উনিশ-কুড়ি বছর বয়স হলো– বেরিয়ে যেতে হবে বাড়ি থেকে। এখন বাঁচতে হবে স্বাধীনভাবে। নিজের ঘর চাই। নিজের গাড়ি চাই। কোনো একটি চাকরি দ্রুত প্রয়োজন।

চাকরি পাওয়া গেল। তাতেও কোনো মানসিক শান্তি নেই। চাকরি সবই অস্থায়ী। কাজ পছন্দ হলো না তো বিদায়। সংসার প্রতিপালন করতে হচ্ছে এক ধরনের অনিশ্চয়তায়। অনিশ্চয়তায় বাস করতে করতে অনিশ্চয়তা চলে আসছে তাদের আচার-আচরণে। তাদের কোনো কিছুই একনাগাড়ে বেশিদিন ভালো লাগে না। কাজেই ইস্ট থেকে ওয়েস্ট। ওয়েস্ট থেকে নর্থে। এক স্ত্রীকেও বেশি দিন ভালো লাগে না। গাড়ির মতো স্ত্রী বদল হয়।

এই করতে করতে সময় ফুরিয়ে যায়। আশ্রয় হয় ওল্ড হোম। জীবনের পরিণতি। এক সময় মৃত্যুবরণ করতে হয়। মৃত্যুর পর দেখা যায় তারা তাদের ধন-সম্পদ উইল করে দিয়েছে প্রিয় বিড়ালের নামে, কিংবা প্রিয় কুকুরের নামে।

আমি আমার দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতায় যা বুঝেছি তা হলো এদের প্রায় সবার চিন্তা-ভাবনা সীমাবদ্ধ। বস্তুকেন্দ্রিক। একটি মেয়ের জীবনের সর্বোচ্চ আকাঙ্ক্ষা হলো চিয়ার লিডার হবে। ফুটবল খেলার মাঠে স্কার্ট উচিয়ে নাচবে। স্কার্টের নিচে তার সুগঠিত পদযুগল দেখে দর্শকরা বিমোহিত হবে। এই তার সবচেয়ে বড় চাওয়া। একটি ছেলে চাইবে মিলিওনিয়ার হতে।

এই অতি সভ্য (?) দেশে আমি দেখি মেয়েদের কোনো সম্মান নেই। একজন মহিলাকে তারে দেখবে একজন উইম্যান হিসেবেই। একটি মেয়ের যে মাতৃরূপ আছে যা আমরা সব সময় দেখি ওরা তা দেখে না। একটি মেয়ে যতদিন পর্যন্ত শারীরিকভাবে আকর্ষণীয় ততদিন পর্যন্তই তার কদর।

যা কিছু হাস্যকর, তার সবই এদের ভাষায়– মেয়েলী, এফিমিনেট। শুনলে অবিশ্বাস্য মনে হলেও সত্যি এই দেশে মেয়েরা একই যোগ্যতায় একই চাকরিতে পুরুষদের চেয়ে কম বেতন পান। বিমানের ক্যাপ্টেন যদি মহিলা হন তাহলে বিমানের যাত্রীদের তা জানানো হয় না। ক্যাপ্টেন পুরুষ হলে তবেই শুধু বলা হয়– আমি অমুক তোমাদের বিমানের ক্যাপ্টেন। মহিলা ক্যাপ্টেনের কথা বলা হয় না। কারণ মহিলা বিমানের দায়িত্বে আছেন জানলেই যাত্রীরা বেঁকে বসতে পারে। আমাদের দেশে মেয়েদের অবস্থা খারাপ তবু একজন মহিলা ডাক্তার একজন পুরুষ ডাক্তারের মতোই বেতন পান। কম পান না।

আমরা আমাদের দেশে একজন মহিলা রাষ্ট্রপ্রধানের কথা চিন্তা করতে পারি। ভাবতে পারি। ওরা তা পারে না। আসছে একশ' বছরেও এই আমেরিকায় কোনো মহিলা প্রেসিডেন্ট বা ভাইস প্রেসিডেন্ট হবে না। অতি সুসভ্য এই দেশ তা হতে দেবে না।

জাতির শরীর যেমন আছে আত্মাও আছে। এই দেশের শরীরের গঠন চমৎকার কিন্তু আত্মা? এর অত্মা কোথায়?

আজ থেকে ৭০ বছর আগে রবীন্দ্রনাথ আমেরিকা এসেছিলেন। নিউইয়র্ক থেকে চিঠি লিখছেন তাঁর আদরের কন্যা মীরা দেবীকে। সেই চিঠিতে আমেরিকার ব্যাপারে তাঁকে উচ্ছ্বসিত হতে দেখা যায়, তাঁর চিঠির অংশ বিশেষ উদ্ধৃত করছি...

> এখানে মানুষের জন্যে মানুষের চিন্তা আমাদের দেশের চেয়ে অনেক বেশি পরিমাণে উদ্বোধিত। এখানে টানাটানি-কাড়াকাড়ি হট্টগোলের ভেতরও বিশ্বমানবের দর্শন পাওয়া যায়। সেই বিরাট পুরুষের দর্শনেই নিজের ব্যক্তিগত জীবনের সুখ- দুঃখের আন্দোলনকে তুচ্ছ করে দেয়। আমাদের দেশে মানুষ অত্যন্ত ছোট হয়ে আছে কেবল যে তার জীবনের ক্ষেত্র ছোট, তা নয় তার চিন্তার আকাশ সঙ্কীর্ণ..."

[পত্রাবলী মীরা দেবীকে লেখা, ১৯০৬-৩৭, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। সনৎ কুমার বাগচি কর্তৃক সংকলিত।]

মজার ব্যাপার হচ্ছে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর পনের বছর পরই আমেরিকা সম্পর্কে তাঁর মত বদলান। তিনি তাঁর কন্যা মীরা দেবীকে আমেরিকা যেতে অনুৎসাহিত করে লিখেন–

> কল্যাণীয়াসু,
>
> মীরু, এখানে মেয়েদের বেশিদিন থাকার ক্ষতি আছে। তার কারণ এখানকার সমাজ সঙ্কীর্ণ এবং যারা আছে তারা অনেকেই নীচের স্তরের মানুষ। এখানে লোকের সংসর্গ অল্প কয়েকজনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ হওয়াতে

মানুষকে বিচার করবার আদর্শ নেবে যায় এবং লোক পরিচয়ের শক্তি দুর্ব্বল হয়ে পড়ে। কলকাতায় সমাজের আদর্শ এখানকার চেয়ে প্রশস্ত এবং উপরের শ্রেণীর। যেটা খেলো এবং vulgar এখানে থাকতে থাকতে সেটা সয়ে যায় এবং তার হেয়তা বুঝতেই পারিনে। অল্প বয়সে, বিশেষত মেয়েদের পক্ষে এটা অত্যন্ত মুস্কিলের। এখানে কতকগুলো বিশেষ বিশেষ বিষয়ে শিক্ষার সুবিধা আছে কিন্তু সামাজিক শিক্ষার জায়গা এটা নয়– অথচ যৌবনারম্ভে সেই শিক্ষা একান্ত আবশ্যক। বুড়িকে নিয়ে যদি তুই এখানে দীর্ঘকাল থাকিস তাহলে তাতে বুড়ির ক্ষতি হবে, এখন সে কথা বুড়ি না বুঝতে পারলেও এর পরে তা অনুতাপের কারণ ঘটতে পারে। কলকাতায় আমাদের যে সমাজ সেই সমাজের সঙ্গে বুড়িকে মিলিয়ে দিতে হবেই, নইলে সে তার নিজের ও বংশের মর্যাদা রক্ষা করতে জানবে না।

মাঝে শরীর খারাপ হয়েছিল এখন সেরে উঠেছি। যেতে হবে দূরে, ঘুরতে হবে বিস্তর, ফিরতে মাসখানেক লাগবে– তার পরে কলকাতায় তোদের একবার দেখে আসব। আমার মাটির ঘরের ভিৎ দিনে দিনে উঁচু হয়ে উঠছে।

ইতি ১ ফেব্রুয়ারী ১৯৩৫

বুড়িকে পদ্যে একটা চিঠি কিছুকাল পূর্বে লিখেছিলুম–পদ্যে সে তার জবাব দেবার চেষ্টা যেন না করে এই আমার সানুনয় অনুরোধ।

এই প্রসঙ্গে আরেকজনের উদ্ধৃতি দেবার লোভ সামলাতে পারছি না। ইনি হচ্ছেন নোবেল পুরস্কার বিজয়ী মহান ঔপন্যাসিক আলেকজান্ডার সোলঝনিৎসিন। নিজ দেশ ছেড়ে গণতন্ত্রের স্বাধীন ভূমি আমেরিকাতে যিনি আশ্রয় নিয়েছেন। হার্বার্ড বিশ্ববিদালয়ের ৩২৭তম কমেন্সমেন্ট অনুষ্ঠানে বক্তৃতা দেবার জন্যে তাঁকে আমন্ত্রণ জানানো হয়। সেই বক্তৃতায় তিনি আমেরিকা এবং পাশ্চাত্য সভ্যতা প্রসঙ্গে তাঁর মোহভঙ্গের কথা অত্যন্ত জোরালো ভাষায় বলেন। পুরো বক্তৃতাটি তুলে দিতে পারলে ভালো হতো আমি অল্পকিছু অংশ তুলে দিলাম–

There are teliltale symptoms by which history gives warning to a threatened or perishing society. Such are, for instance, a decline of the arts or a lack of great statesmen. Indeed, sometimes the warnings are quite explicit and concrete. The center of your democracy and of your culture is left without electric power for a few hours only, and all of a sudden crowds of American citizens start looting and creating hovoc. The smooth surface film must be very thin, then, the social system quite unstable and unhealthy.

অধ্যাপক ক্লার্ক ব্লেইস দুপুরে তাঁর সঙ্গে খাবার জন্যে নিমন্ত্রণ করেছেন। ভারতী মুখোপাধ্যায় কেলিফোর্নিয়া থেকে ফিরে এসেছেন– এই উপলক্ষে তাঁর সঙ্গেও দেখা হবে। ক্লার্ক এসে নিয়ে গেলেন। ভেবেছিলাম রাজপ্রাসাদের মতো বিশাল বাড়ি দেখব– তা নয়, ছোট্ট বাড়ি। ভারতী মুখোপাধায়ের সঙ্গেও দেখা হলো। শাড়ি পরা বাঙালি মেয়ে। এককালে ডাকসাইটে রূপসী ছিলেন তা বোঝা যায়। রূপের খানিকটা এখনো ধরে আছে। তিনি নিজেও একজন ঔপন্যাসিক। সাহিত্য চর্চা করেন ইংরেজি ভাষায়। তাঁর লেখা একটা উপন্যাস 'জেসমিন' আমেরিকায় বেস্ট সেলার হয়েছে। অবশ্যি এই উপন্যাসে তিনি ভারতকে ছোট করে দেখিয়ে পশ্চিমের জয়গান করেছেন।

ভেবেছিলাম মন খুলে কথাবার্তা বলা যাবে– তা সম্ভব হলো না। কারণ আমার সঙ্গে নিমন্ত্রিত হয়ে এসেছেন শ্রীলংকার কবি জেন এবং তাঁর স্ত্রী প্রতিভায় মুগ্ধ স্বামী। বলাই বাহুল্য জেন সঙ্গে করে একগাদা কবিতা নিয়ে এসেছেন এবং ক্রমাগত পড়ে যাচ্ছেন। এক সময় তিনি প্রাকৃতিক নিয়মেই ক্লান্ত হয়ে পড়লেন– ভাবলাম এইবার হয়তো কথা বলার সুযোগ পাওয়া যাবে, তা পাওয়া গেল না। জেন-এর স্বামী তখন আসরে নামলেন। ছোটবেলা থেকে তাঁর যে কিছু অলৌকিক ক্ষমতা আছে সেই সব বলতে লাগলেন। জেন স্বামীকে উস্কে দিচ্ছেন– "দেবীর সঙ্গে দেখা হবার গল্পটা বলো হানি।" "হানি, প্রিকগনিশন ড্রিমের ঐ অসাধারণ গল্পটা বলো।"

ভদ্রলোক অদ্ভুত সব গল্প শোনাতে লাগলেন। বিংশ শতাব্দীতে– আমেরিকায় বসে এইসব গাঁজাখুরী গল্প শোনার কোনো মানে হয় না। কিন্তু যেহেতু আমরা সভ্য মানুষ– কান পেতে শুনে যাই। ভদ্রলোকের একটি কাহিনী হলো– দেবি স্বরস্বতীর সঙ্গে মুখোমুখি সাক্ষাৎ। এক দুপুরে তিনি তাঁর গ্রামের রাস্তায় হাঁটছিলেন। বয়স খুবই কম–ন'-দশ। কোথাও লোকজন নেই। হাঁটতে হাঁটতে পুরোনো এক মন্দিরের কাছে চলে এলেন। মন্দিরের কাছে এসেই মিষ্টি ফুলের গন্ধে চমকে উঠলেন। তারপর দেখেন মন্দিরের ভেতর থেকে দেবী সরস্বতী বের হয়ে হাত ইশারা করে তাঁকে ডাকছেন।

আমি গল্পের এক পর্যায়ে উঠে গিয়ে অধ্যাপক ক্লার্কের ঘরের সাজসজ্জা দেখতে লাগলাম। সমস্ত ঘর ভর্তি ছোট ছোট ফ্রেম বাঁধানো প্রাচীন সব গ্রন্থের পৃষ্ঠা। ক্লার্ক বুঝিয়ে দিচ্ছেন কোনটা কি। এর মধ্যে আছে মূল শাহনামা গ্রন্থের এক পৃষ্ঠা যা তিনি তিন হাজার ডলার দিয়ে কানাডা থেকে কিনেছেন। দু'হাজার বছর আগের কোরআন শরীফের একটি পৃষ্ঠা। মোগল আমলের কিছু গ্রন্থের মলিন পাতা। সবই অতি যত্নে সংরক্ষিত।

খাবার ডাক পড়ল।

আশা করেছিলাম ভাত-ডাল-মাছ এইসব থাকবে। তা না, পিজা ডিনার। সেই পিজাও ঘরে বানানো নয়– দোকান থেকে কিনে আনা। পিজা খাচ্ছি এবং শ্রীলংকার ভদ্রলোকের অলৌকিক গল্প শুনছি। জেনের কবিতার মতো উনার গল্পও অফুরান।

প্রফেসার ক্লার্ক এক পর্যায়ে বললে, "আমরা হুমায়ূনের গল্প শুনি।"

আমি বললাম, "আমার তো কোনো অলৌকিক ক্ষমতা নেই কি গল্প বলব?"

"আমেরিকা প্রসঙ্গে অভিজ্ঞতার গল্প শুনি। ভেতর থেকে নিজেদের দেখা কঠিন। বাইরে থেকে দেখা সহজ। আমি এক বছর কোলকাতায় ছিলাম। তার ওপর ভিত্তি করে একটি বই লিখেছি– 'Nights and Days and Calculta' তোমাকে একটা কপি দেব। এখন তুমি বলো তুমি যে নর্থ ডেকোটায় ছিলে, কি দেখেছ? বরফ ছাড়া কি দেখেছ?"

আমি নর্থ ডেকোটায় এক হাসপাতালে আমার মেজ মেয়ে শীলার জন্মের গল্পটি শুরু করলাম। তার জন্মমুহূর্তে আমাকে শীলার মা'র পাশে হাত ধরে দাঁড়িয়ে থাকতে হয়েছিল। শিশু জন্মের এই ভয়াবহ ব্যাপারটাই প্রত্যক্ষ করতে হয়েছে। আমি চলে গিয়েছিলাম এক ধরনের ঘোরের রাজত্বে। মনে হচ্ছিল চোখের সামনে যা দেখছি তা সত্যি নয় স্বপ্ন। স্বপ্ন ভঙ্গ হলো গুলতেকিনের কথায়, তুমি এরকম করে দাঁড়িয়ে আছ কেন? বাচ্চার কান্না শুনতে পাচ্ছ না? আজান দাও। আমি বিকট শব্দে আজান শুরু করলাম। ডাক্তার এবং নার্সদের মধ্যে হৈচৈ পড়ে গেল– এই বাঙাল কি করছে?

একটা মজার গল্প। যাদেরকেই এই গল্প করেছি তারাই প্রাণ খুলে হেসেছে। এখানে ভিন্ন ব্যাপার হলো। দেখি কবি জেন-এর চোখ ছলছল করছে। মনে হচ্ছে এক্ষুনি কেঁদে ফেলবেন। তিনি কাঁপা কাঁপা গলায় বললেন, আমি এমন মানবিক গল্প এর আগে শুনিনি। আমি অভিভূত। এই নিয়ে একটি কবিতা না লেখা পর্যন্ত আমি শান্তি পাব না। আমার গায়ের সব লোম খাড়া হয়ে গেছে। দেখো হুমায়ূন দেখো।

তিনি তাঁর হাত আমার সামনে এগিয়ে দিলেন। সেই হাতে কোনো লোম নেই কাজেই লোম খাড়া হলো কি হলো না তা বুঝতে পারলাম না তবে অত্যন্ত অস্বস্তি বোধ করতে লাগলাম– একটা মজার গল্প বলে এ কি বিপদে পড়লাম।

এই ঘটনার দিন সাতেক পরের কথা। সন্ধ্যাবেলা প্রেইরি বুক স্টোরে কবিতা পাঠের আসর বসেছে। কবিতা শুনতে গিয়েছি। প্রথম কবিতা পাঠ করলেন পোলিশ কবি ও গল্পকার পিটার। তারপর উঠে দাঁড়ালেন জেন। গম্ভীর গলায় বললেন–

"আমি যে কবিতাটি পাঠ করব তা উৎসর্গ করা হয়েছে বাংলাদেশের ঔপন্যাসিক হুমায়ূন আহমেদকে। তাঁর একটি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার গল্প শুনে আবেগে অভিভূত হয়ে আমি কবিতাটি লিখি।"

সব দর্শক ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল আমার দিকে। উঠে দাঁড়িয়ে দর্শকদের দিকে আমাকে নড করতে হলো। জেন কবিতা পাঠ শুরু করলেন– আবার তাঁর চোখে পানি এসে গেল। এবং আশ্চর্য আমার নিজের চোখও ভিজে উঠল। এই অতি আবেগপ্রবণ কবির কবিতাটি পাঠক-পাঠিকাদের জন্যে হুবহু তুলে দিচ্ছি। একজন কবি আমার সামান্য একটি গল্প শুনে কবিতা লিখে আমাকে উৎসর্গ করেছেন এই আনন্দও তো কম নয়।

DESH
[POEM FOR HUMAYAUN]

Beside your wife's bed side awaiting the birth
Of your child you uttered the name of God
Many times
Allah-U-Akbar-
This was not your country
You were fare away but is one ever apart
For those gods who are so intimate
A part of your life?
You will nevr be alone here
Even in the snowy deserts of winter
Or when the trees shed all the leaves in Fall,
When you pray for the safety of mother Of child,
The gods have a way of following you
And you of taking them with you

Just as, over the oceans, you carry
A Litlle of the Desh, the earth of your
Country and when you are lonely, touch it
As you would its fields, its rivers and its trees
And feel that this is your home.
It is where you belong.
I also remember your words, friend,
"My mother told me, fill your palm
with some soil of the Desh
when my daughter was born
Or else, the baby will cry for the soil"

But those, tear won't they irrigate
The arid earth of our lives?

সন্ধ্যা থেকে টিভির সামনে কম্বল মুড়ি দিয়ে বসে আছি। বাইরে প্রচণ্ড ঠাণ্ডা। তুষার পড়ছে না তবে তাপমাত্রা শূন্যের নিচে নেমে গেছে। ঘরে হিটিং-এর ব্যবস্থা আছে। সেই ব্যবস্থা কাজ করছে বলে মনে হচ্ছে না। আমেরিকানরা একটি নির্দিষ্ট দিনে হিটিং চালু করে– সেই দিন আসার এখনো দেরি আছে। শীতে কাঁপছি, মনটাও খারাপ হয়ে আছে। কিছুক্ষণ আগে বাসায় টেলিফোন করেছিলাম– ছোট মেয়ে টেলিফোন ধরে কাঁদতে কাঁদতে বলল– বাবা, আম্মা আমাকে মেরেছে।

"কেন মেরেছে মা?"

"শুধু শুধু মেরেছে।"

বলেই আমার অতি আদরের মেয়ে গলা ফাটিয়ে কাঁদতে লাগল। আমি তের হাজার মাইল দূরে। হাত বাড়িয়ে তাকে আদর করতে পারছি না। আমার নিজের চোখও ছলছল করতে লাগল, কোমল গলায় বললাম–

"তোমার জন্যে কি কি আনতে হবে আরেকবার বলো মা।"

সে ধরা গলায় বলল, কিছু আনতে হবে না, তুমি এসে আমাকে আদর করো।

আমি মন খারাপ করে টেলিফোন রেখে টিভির সামনে এসে বসেছি। ভালো

প্রোগ্রাম হচ্ছে– সিচুয়েশন কমেডি কিন্তু মন দিতে পারছি না। বারবার মনে হচ্ছে– কেন এলাম এই দেশে, কি প্রয়োজন ছিল?

আমেরিকা দেখা? আমেরিকা জানা? কি হবে আমেরিকা দেখে এবং জেনে?

নিজের দেশে এবং নিজের দেশের মানুষকে কি আমি ঠিকমত জানতে পেরেছি? বা সত্যিকার অর্থে জানার চেষ্টা করেছি?

টেলিফোন বাজছে। উঠে গিয়ে টেলিফোন ধরলাম। ঢাকা থেকে গুলতেকিন টেলিফোন করেছে।

"শোনো, বুঝতে পারছি মেয়ের সঙ্গে কথা বলে তোমার মন খারাপ হয়েছে। এই জন্যেই টেলিফোন করলাম। তোমার মেয়ে শান্ত হয়ে ঘুমুচ্ছে। আমি তাকে সামান্য বকা দিয়েছিলাম– বড় যন্ত্রণা করে। মাঝে মাঝে ওদের বকা দেয়ার অধিকার তো আমার আছে। আছে না?"

"অবশ্যই আছে।"

"তোমার মন ভালো হয়েছে তো?"

"হয়েছে। টেলিফোন করার জন্যে ধন্যবাদ।"

"থাক, আমেরিকানদের মতো ফর্মাল হবার দরকার নেই। খাওয়া-দাওয়া করেছ?"

"এখনো করিনি– রান্না শুরু করব।"

"আজকের মেনু কি?"

"ভাত এবং ডিমভাজা।"

"তুমি তো মনে হচ্ছে আমেরিকান সব ডিম খেয়ে শেষ করে ফেলছ।"

"কি করব বলো ডিম ছাড়া তো আর কিছু রাঁধতে পারি না।"

আবার টিভির সামনে এসে বসলাম। এখন প্রোগ্রামগুলি ভালো লাগছে। ভাঁড়ামো ধরনের রসিকতাতেও প্রচুর হাসি পাচ্ছে। রাত দশটার দিকে ডিম ভাজতে গেলাম। এখানকার প্রোগ্রামের একটি বড় অংশ হচ্ছে নিজের সংসার গুছিয়ে নিজের মতো করে থাকা। ঘুরে বেড়ানো। মাঝে মাঝে লেখকদের প্যানেল ডিসকাশন। ইচ্ছে করলে সেখানে যাওয়া যায় ইচ্ছা না করলে যাওয়ার দরকার নেই। লেখকরা নিজেদের লেখা সম্পর্কে বলেন, কবিতা পড়েন বা গল্প পড়ে শোনান। সবই খুব ঘরোয়া ভঙ্গিতে। কোনোদিন আসর বসে কফি শপে, কোনোদিন আইসক্রিম শপে, কোনোদিন পথের মোড়ে।

একদিন আমাদের বাড়ির লনে আসর বসল। বার্বিকিউ হচ্ছে, বিয়ার খাওয়া হচ্ছে– এর মধ্যেই গল্প পাঠের আসর। পাঠ করা হবে বাংলাদেশের গল্প। আইওয়া

বিশ্ববিদ্যালয়ে অভিনয় কলায় পড়াশোনা করছে এমন একজনকে ঠিক করা হলো আমার ১৯৭১ উপন্যাসটির ইংরেজি অনুবাদ পড়ে শোনানোর জন্যে। সম্ভবত আমার পড়ার ওপর ওদের আস্থা নেই। উপন্যাসটির অনুবাদ করেছেন ঢাকা কলেজের ইংরেজি ভাষার অধ্যাপিকা রহিমা খাতুন। খুব সুন্দর অনুবাদ। পাঠও খুব চমৎকার হলো। এত ভালো হবে আমি নিজেও ভাবিনি। আমি অবশ্যি সব সময়ই নিজের লেখার ভক্ত। আজ যেন আরো ভালো লাগছে।

সিকাট তার একটি এক অঙ্কের নাটক অভিনয় করে দেখালেন। একটিই চরিত্র। কুড়ি মিনিটের অভিনয়। মূল নাটক টেগালোগ ভাষায় লেখা– অভিনীত হলো ইংরেজি ভাষায়। সবাই খুব আগ্রহ ও আনন্দ নিয়ে দেখলেন। পলিটিক্যাল নাটক। লেখা হয়েছে মার্কোসের সময়কে বিদ্রূপ করে।

সিকাট অভিনয় শেষে মার্কোসের আমলের নৃশংসতার একটি গল্পও বললেন– ফিলিপাইনে একবার একটি আন্তর্জাতিক অনুষ্ঠান হবে। বিশ্ব সুন্দরী প্রতিযোগিতা। মার্কোস হুকুম দিলেন নতুন একটি ভবন তৈরি করতে হবে এবং তা করতে হবে এক মাসের মধ্যে। ভবন তৈরি শুরু হলো– দিনরাত কাজ হচ্ছে। এমন সময় একটা দুর্ঘটনা ঘটল। ছাদ ধসে পড়ল। পঞ্চাশ জনের মতো শ্রমিক আটকা পড়ে গেল। বেশিরভাগই মারা গেল তবে কিছু আহত হয়েও ভেতরে রইল। ওদের উদ্ধার করতে হলে আরো দিন সাতেক লাগবে। অথচ হাতে সময় নেই। মার্কোস হুকুম দিলেন উদ্ধারের দরকার নেই। যথাসময় কাজ শেষ হওয়া চাই। হলোও তাই।

শিউরে উঠতে হয় গল্প শুনে। আমরা কোথায় আছি? কোন জগতে বাস করছি? এই কি আমাদের সভ্যতা? আমরা মধ্যযুগীয় নৃশংসতার কথা বলি– এই যুগের নৃশংসতা কি মধ্যযুগের চেয়ে কিছু কম? মনে তো হয় না।

পার্টি পুরোদমে চলছে। বার্বিকিউ হচ্ছে, বিয়ার খাওয়া হচ্ছে। পৃথিবীর সব দেশের লেখকই কি পানীয়ের প্রতি বিশেষ মমতা পোষণ করেন? অবস্থাদৃষ্টে তাই মনে হচ্ছে। ব্রাজিলের লেখক রেইমুন্ডু ক্যারেরো পুরো মাতাল হয়ে পড়েছেন বলে মনে হলো। আবোলতাবোল বকছেন এবং লাফালাফি করছেন। খানিকক্ষণ পর পর আমার দিকে তাকিয়ে হুংকার দিচ্ছেন– Bangladesh! Bangladesh! প্যালেস্টাইনের মহিলা কবিকে জড়িয়ে ধরে চুমু খেলেন। সেই বেচারির পুরো ব্যাপারটি হেসে উড়িয়ে দেয়া ছাড়া কিছু করার রইল না। অন্য মহিলারাও খানিকটা শংকিত বোধ করছেন।

ভারতীয় কবি গগন গিল আমার কাছে এগিয়ে এসে শুকনো গলায় বললেন, হুমায়ূন খুব বিপদে পড়েছি।

"কি বিপদ?"

"ঐ চেক কবি আমাকে ঝামেলায় ফেলে দিয়েছে। কি করব বুঝতে পারছি না।'

"কি ঝামেলায় ফেলেছে?"

"ও বলছে তোমার ড্রেস অসম্ভব সুন্দর। আমাকে তুমি এরকম একটা ড্রেস পরিয়ে দাও। ঐ ড্রেস পরে আমি পরবর্তী পার্টিতে যাব। আমি তাকে বলেছি এই ড্রেসটার নাম শাড়ি, এটা মেয়েদের পোষাক। তুমি পুরুষ মানুষ। তোমার জন্যে নয়। সে মানছে না। সে বলছে– তোমরা মেয়েরা তো আমাদের শার্ট-প্যান্ট পরছ। আমরা তোমাদের একটা ড্রেস পরলে অসুবিধা কি? তা ছাড়া পুরুষ-রমণীর কোনো ভেদাভেদ আমার কাছে নেই।'

"এই অবস্থা হলে ওকে একটা শাড়ি পরিয়ে ছেড়ে দাও। প্রচুর ছবি তুলে দেশে নিয়ে যাও। ছবি দেখে সবাই মজা পাবে।"

"তুমি কি সত্যি তাই করতে বলছ?"

"হ্যাঁ বলছি।"

আমি নিজে কখনো মনে করি না একজন লেখক অন্য দশজনের চেয়ে আলাদা কিছু। কোনো লেখকই হয়তো তা মনে করেন না তবে নিজেদের খানিকটা আলাদা করে দেখানোর ইচ্ছা তাদের থাকে না তাও বোধ হয় সত্যি না। সচেতনভাবে না হলেও অবচেতন একটি বাসনা বোধ হয় থেকেই যায়। নিজেকে আলাদা করে দেখানোর এই প্রবণতাটি প্রকাশ পায় লম্বা চুলে, লম্বা দাড়িতে কিংবা বিচিত্র পোশাক-আশাকে। রবীন্দ্রনাথের মতো প্রতিভাধর মানুষকেও আলখাল্লা বানিয়ে পরতে হয়েছে।

প্রসঙ্গক্রমে আর্জেন্টিনার লেখক এনরিখে বুটির কথা বলি। চমৎকার মানুষ। মাথা ভর্তি ঘনকালো চুল। হঠাৎ এক সকালে দেখি পুরো মাথা কামিয়ে বসে আছেন। কি ব্যাপার জিজ্ঞেস করতেই বললেন, কিছু করার ছিল না। ঘরে বসে বোর হচ্ছিলাম। কাজেই মাথাটা কামিয়ে ফেললাম।

দেখলাম তিনি মাথা পেতে বসে আছেন, অন্য লেখকরা কামানো মাথায় হাত বুলিয়ে যাচ্ছেন। এনরিখে বুটি বিমলানন্দে হাসছেন। পুরো ব্যাপারটায় মনে হলো তিনি খুব মজা পাচ্ছেন।

রাতে মে ফ্লাওয়ারের হল ঘরে আমার লেখা ধারাবাহিক টিভি নাটক অয়োময়ের একটি পর্ব। (চতুর্থ পর্ব, এই পাগলকে নৌকায় করে গ্রামের বাইরে ফেলে দিয়ে আসা হয়) দেখানো হলো। প্রজেকশন টিভির মাধ্যমে বড় পর্দায়

সিনেমার মতো করে দেখা। সাব টাইটেল নেই, কাহিনী বোঝা খুব মুশকিল। অবশ্যি এটা বক্তৃতা এবং লিখিতভাবে কি হচ্ছে না হচ্ছে আগেই বলে দেয়া হয়েছে তবু মনে হলো অধিকাংশ দর্শক বেশ কনফিউজড। অনেকেই দুটি বৌ নিয়ে অবাক। দু'জন বৌ কি করে থাকে? পাগলকে চিকিৎসা না করে গ্রামের বাইরে ফেলে দিয়ে আসার ব্যাপার কি সত্যি ঘটে?

কিছু আমেরিকান ছাত্র– যারা লেখক নয় তবে ক্রিয়েটিভ রাইটিং-এর ছাত্র, বিশ্ববিদ্যালয়ে কোর্স নিচ্ছে কি করে লেখক হওয়া যায়– তারা অয়োময়ে মির্জার দুই বৌ নিয়ে আমাকে কঠিন আক্রমণ করল। তাদের ধারণা এটা এসেছে মুসলিম কালচার থেকে। ইসলাম ধর্মে চার বিয়ের বিধান– কাজেই এই ধর্মাবলম্বী সম্প্রদায়ে বহু বিবাহ ঢুকে পড়েছে। উঠে এসেছে তাদের সাহিত্যে। শেষ পর্যন্ত বিরক্ত হয়ে বললাম– আমার তো মনে হয় প্রকৃতিই বহু বিবাহ সমর্থন করে। তাকিয়ে দেখো জীব জগতের দিকে একটি পুরুষ নেকড়ে অনেক ক'টি মেয়ে নেকড়ে নিয়ে ঘুরে বেড়ায়, বন্য মহিষ, বাইসন, সিংহ, শেয়াল সবার বেলায় এই নিয়ম। মানুষ তো এক অর্থে পশু, তার বেলাতেই হবে না কেন? প্রকৃতি এটা চায় বলেই মেয়েদের সংখ্যা পুরুষদের চেয়ে বেশি। কূট তর্কে হারিয়ে দিলাম ঠিকই কিন্তু আমি তো জানি তর্কে ফাঁক আছে। জীবজগতে অনেক প্রাণী আছে যাদের বেলায় উল্টো নিয়ম– একটি মেয়ে প্রাণীর পেছনে থাকে এক ঝাঁক পুরুষ, যেমন রানী মৌমাছি।

তর্কে জেতার আনন্দ আছে তবু মনটা একটু খারাপ হলো কারণ অয়োময়ে বহু বিবাহকে সহজ এবং স্বাভাবিক নিয়মে উপস্থিত করা হয়েছে। তার জটিলতাকে তুলে ধরা হয় নি। এই নাটক দেখলে যে কোনো পুরুষ ছোট্ট নিঃশ্বাস ফেলে ভাবতে পারেন– দুটি বৌ থাকা তো মন্দ না।

একজন আধুনিক মানুষ হিসেবে এই জাতীয় ধারণাকে আমি অবশ্যই প্রশ্রয় দিতে পারি না।

আমেরিকানরা খুব জরিপের ভক্ত।

সব কিছুরই জরিপ হয়ে যাচ্ছে। জরিপ চালাচ্ছে অসংখ্য প্রতিষ্ঠান। টাকার বিনিময়ে তারা জরিপ করে দেবে। হেন বিষয় নেই যার ওপরে তারা জরিপ করে

নি। প্রেসিডেন্ট বুশ এই কাজটি করেছেন এতে তাঁর জনপ্রিয়তা বাড়ল না কমল? কতটুক বাড়ল বা কতটুক কমল? হয়ে গেল জরিপ। কিছু মজার জরিপের উদাহরণ দিচ্ছি।

ক) শতকরা ৪ ভাগ আমেরিকান মহিলা প্যান্টি পরে না।[১]

খ) শতকরা ৪ ভাগ আমেরিকান মহিলার কোনো ব্রা নেই।[২]

গ) শতকরা ৫ ভাগ আমেরিকান রাতে একা বাড়িতে থাকতে ভয় পায়।[৩]

ঘ) শতকরা ৬ ভাগ আমেরিকান মহিলা সম্পূর্ণ নগ্ন হয়ে ঘুমুতে যান।[৪]

ঙ) শতকরা ১৬ ভাগ আমেরিকান মনে করে ফুসফুস হচ্ছে পরিপাক যন্ত্র।[৫]

চ) শতকরা ২৫ ভাগ আমেরিকান মনে করে সূর্য হচ্ছে একটি গ্রহ।[৬]

ছ) শতকরা ৮৩ ভাগ আমেরিকান মনে করে বাচ্চাদের শক্ত মার দিয়ে মাঝে মাঝে শাসন করা উচিত।[৭]

১·২. [এই দু'টি জরীপ করেছেন Fair child সংস্থা। "The costomer speaks about her werdrobe" Fair child publication, 1978]

৩. [Public opinion February/March, 1986]

৪. [The Harper index, 1987]

৫. [A national survey of public peraptions of Digestive health anol Diseaes. National Digeotive disease education program, 1984]

৬. [Contemporary cosmological Beliefs social studeies of scieva, 1987]

৭. [General social sarveys, 1972-1987, University of Chicago.]

সবার ধারণা আমেরিকানরা খুব বকবক করে। এই ধারণা হয়েছে আমেরিকান ট্যুরিস্টদের দেখে। ট্যুরিস্টরা সত্যি সত্যি বকবক করে। এরা বাড়ি থেকে বের হয়ে দেশ-বিদেশে ঘুরে 'ফান' করার জন্যে। এই বকবকানি সম্ভব ফানের অংশ। ওদের নিজ ভূমিতে ওরা মুখবন্ধ জাতি। অন্তত আমার তাই মনে হয়। অপ্রয়োজনের কোনো কথা বলবে না। বেশির ভাগ কথাবার্তাই 'আজকের আবহাওয়া অসাধারণ'-এর মধ্যেই সীমাবদ্ধ। তর্ক করতে এরা তেমন পছন্দ করে না। কোনো প্রসঙ্গ নিয়ে কথা বলার সময় হঠাৎ যদি ওরা কথা বন্ধ করে দেয় তাহলে বুঝতে হবে ওরা এই মত সমর্থন করছে না।

ওরা নিতান্ত আপনজনের কাছেও খুলে কিছু বলে না বলেই আমার ধারণা। একা একা থাকতে হবে। ব্যক্তিসত্তার বিকাশ করতে হবে। যৌথ বলে কিছু নেই। ব্যক্তিসত্তা নামক সোনার হরিণ খুঁজতে খুঁজতে এক সময় ভয়াবহ নিঃসঙ্গতার

শিকার এদের হতে হয়। দেখা দেয় মানসিক সমস্যা। ছুটে যায় কাউন্সিলারদের কাছে। কাউন্সিলার হচ্ছে সাইকিয়াট্রিস্ট। কাউন্সিলার কি করেন? তেমন কিছুই করেন না। মন দিয়ে রুগীর কথা শুনেন এবং মোটা অংকের টাকা নেন। এতেই রুগীর রোগ সেরে যায়। কথা বলতে হয় টাকা দিয়ে। সাইকিয়াট্রিস্টদের ব্যবসা এই দেশে রমরমা। যতই দিন যাচ্ছে ব্যবসা বাড়ছে। সবারই সমস্যা।

সমস্যা হবে নাইবাকেন?

আমাদের গোপন কথা বা দুঃখের কথা বলার কত অসংখ্য মানুষ আছে। মা-বাবা আছেন, খালা-খালু আছেন, চাচা-চাচি আছেন। বন্ধুবান্ধবরা তো আছেই। ওদের তো এসব কিছু নেই। নিজের বাড়িতেই এদের শিকড় নেই আর খালার বাড়ি।

আমাদের একটি টিনএজার ছেলে বাড়ি থেকে পালিয়ে গেলে আমরা তেমন মাথা ঘামাই না। কারণ আমরা জানি সে কোথায় গেছে– মামার বাড়ি গেছে আর যাবে কোথায়? আসুক ফিরে তারপর ধোলাই দেয়া হবে।

ধোলাই দেয়া হয় না। কারণ ঐ ছেলে বাড়িতে একা ফিরে না, বড় মামাকে সঙ্গে নিয়ে ফিরে। যাতে শাস্তির হাত থেকে বেঁচে যেতে পারে।

ছেলের মামা গম্ভীর গলায় বলেন, ছেলে মানুষ একটা অপরাধ করে ফেলেছে, বাদ দিন দুলাভাই।

ছেলের বাবা হুংকার দিয়ে ওঠেন, না না এইসব বলবে না, এই হারামজাদাকে আজকে আমি খুন করে ফেলব। কত বড় সাহস বাড়ি থেকে পালিয়ে যায়।

"আহা থাক না– ছেলেমানুষ।"

"ছেলেমানুষ ছেলেমানুষ বলবে না পনেরো বছরের ধাড়ি কুলাঙ্গার।" বলতে বলতে বাবা রাগ সামলাতে না পেরে ছেলের গালে চড় বসিয়ে দিলেন। ছুটে এলেন ছেলের মা, ছুটে এলো বোনেরা। ভাইকে আগলে ধরল। ইতিমধ্যে খবর পৌঁছে গেছে। আত্মীয়স্বজন পাড়া-প্রতিবেশী জড় হচ্ছে। বিরাট কেতলিতে চা বসানো হয়েছে। বাবাকে দেখা যাচ্ছে অসময়ে কোট গায়ে দিয়ে কোথায় যেন যাচ্ছেন।

মা বললেন, "এই অবেলায় কোথায় যাচ্ছ?"

বাবা জবাব দিলেন না কারণ তিনি যাচ্ছেন নিউ মার্কেট। পাবদা মাছ কিনতে। টমেটো দিয়ে পাবদা মাছ তাঁর ছেলের বড়ই পছন্দ।

এ ধরনের মানবিক দৃশ্য কি এখানে কল্পনা করা যায়?

কখনোই না। এখানে অসংখ্য ছেলে রাগ করে বাড়ি ছেড়ে বের হয়ে যায়।

ন'বছর দশ বছর বয়স–অভিমানী শিশু। যাবে কোথায়? যাবার জায়গা নেই। কোনো পার্কে, কোনো শপিং মলের কোনে দাঁড়িয়ে চোখ মুছতে থাকে। পথচারীরা তাকে কিছু জিজ্ঞেস করে না। জিজ্ঞেস করলেও লাভ নেই– ক্রন্দনরত শিশু অপরিচিত কাউকে কিছুই বলবে না। কারণ অতি অল্প বয়সেই তাকে শেখানো হয়েছে– Never talk to strangers অপরিচিত কারো সঙ্গে কথা বলবে না।

এক সময় পুলিশ আসে। অভিমানী শিশুকে বাড়ি পৌঁছে দেয়। বাড়িতে যে দৃশ্যের অবতারণা হয়তো নিশ্চয়ই খুব সুখের নয়। অথচ শিশুদের জন্যে আইন-কানুন খুবই কড়া। শিশুদের মারধর করলে চাইল্ড এবিউজ আইনে বাবা-মা'র জেল-জরিমানা দুইই হয়ে যাবে।

প্রসঙ্গক্রমে চাইল্ড এবিউজ মামলার একটি গল্প বলি। ঘটনার স্থান– ওয়াশিংটনের সিয়াটল। একটি ভারতীয় পরিবার। তাদের সর্ব কনিষ্ঠ শিশুটি খাট থেকে পড়ে হাত ভেঙে ফেলেছে। হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলো। ডাক্তাররা প্লাস্টার করে দিলেন।

কিছুদিন পর আবার বাচ্চাটিকে হাসপাতালে আনা হলো– সে গরম পাতিলে হাত দিয়ে হাত পুড়িয়ে ফেলেছে। চিকিৎসা করে সুস্থ করা হলো।

কিছুদিন পর আবার সমস্যা। শিশুটি দোতলার সিঁড়ি থেকে গড়িয়ে পড়ে পা ভেঙে ফেলেছে।

ডাক্তাররা চিকিৎসা করে পা ঠিক করলেন কিন্তু বাচ্চাটিকে বাবা-মা'র কাছে ফেরত দিলেন না। বললেন, তোমরা শিশু মানুষ করার জন্যে উপযুক্ত নও। একে পালক দিয়ে দেয়া হবে।

ফোস্টার প্যারেন্টস (পালক বাবা-মা) একে মানুষ করবে। সরকার থেকে মামলা দায়ের করা হলো।

এখানে আমি প্রায়ই গাড়ি দেখি যার পেছনে স্টিকার "তুমি কি তোমার শিশুকে আজ জড়িয়ে ধরেছ?"

এই স্টিকারের তেমন কিছু মূল্য আছে কি?

আমেরিকায় শিশু জন্ম হার আশংকাজনকভাবে কমে যাচ্ছে।

বাবা-মা'রা শিশু মানুষ করার কঠিন দায়িত্বে যেতে চাচ্ছেন না। শিশু মানুষ হয় পরিবারে সেই পরিবারই ভেঙে পড়ছে– কে নেবে শিশুর যন্ত্রণা? জীবনকে উপভোগ করতে হবে। আনন্দ খুঁজে বেড়াতে হবে। শিশু মানেই বন্ধন।

বিয়ে এখনকার তরুণ সমাজে খুব আকর্ষণীয় কিছু নয়। কারণ সেখানেও

বন্ধন। একটি মাত্র তরুণীর সঙ্গে জীবন কাটিয়ে দিতে হবে- কি ভয়ংকর। তারচে' অনেক ভালো লিভিং টুগেদার। একটি এ্যাপার্টমেন্ট ভাড়া করে পছন্দের তরুণ তরুণীরা একত্রে বসবাস। যদি কোনো কারণে বনিবনা না হয় জিনিসপত্র ভাগাভাগি করে সরে পড়ো দু'দিকে। সাধু ভাষায় বলা চলে- "গেল ফুরাইল। মোকদ্দমা হইল ডিসমিস।" এখানে সবাই দ্রুত মামলা ডিসমিস করতে চায়। মামলা বাঁচিয়ে রাখতে চায় না।

আজ হ্যালোইন।

হ্যালোইন এদের একটি চমৎকার উৎসব। উৎসবের উৎপত্তি কোথায় জানি না।

কয়েকজনকে জিজ্ঞেস করেছি কিছু বলতে পারেনি। আমেরিকানদের সাধারণ জ্ঞান সীমাবদ্ধ। খুবই সীমাবদ্ধ। হ্যালোইন ব্যাপারটি কি জিজ্ঞেস করা মাত্র অত্যন্ত উৎসাহের সঙ্গে বলে- ও হ্যালোইন হচ্ছে ফান নাইট। খুব ফান হয়। বাচ্চারা নানা রকম ভূতের মুখোশ পরে বের হয়। বাড়ি বাড়ি গিয়ে বলে- 'Treat or tricks' তখন ওদের চকলেট-লজেন্স এইসব দিতে হয়। বাড়ি সাজাতে হয়- কুমড়ো দিয়ে।

এর সবই জানি. আমার প্রশ্ন ছিল এই উৎসবটা শুরু হলো কিভাবে? হঠাৎ আমেরিকানদের কেন মনে হলো ভূতপ্রেতের জন্যে একটা রাত থাকবে? কেউ জানে না।

বইপত্র ঘেঁটে পেলাম অক্টোবরের ৩১ তারিখে সন্ধ্যায় এই দিবস উদযাপন করা হয়। এটি একটি ধর্মীয় উৎসব, All saint's day (Allhallows)-র পূর্ব দিবস। সব সিরিয়াস বিষয় নিয়ে রসিকতা করা আমেরিকানদের মজ্জাগত। এই দিনটিকে ওরা রসিকতার দিন করে নিয়েছে। সেই রঙ্গ-রসিকতা কোন পর্যায়ে পৌঁছেছে তার উদাহরণ দেয়া যাক- হ্যালোইনের ফান পরিপূর্ণ করার জন্যে নিউইয়র্কে প্রতি বছর কিছু দরিদ্র মানুষকে পিটিয়ে মেরে ফেলা হয়। কিছু বাড়িঘরে আগুন দেয়া হয়। এই হলো ফানের নমুনা।

আমাদের বাড়িতে বাচ্চাকাচ্চারা ভূত সেজে আসবে তা মনে হয়নি তবু কিছু চকলেট কিনে রেখে দিলাম। যদি আসে?

না আসারই কথা। বাড়ির উঠোনে কোনো কুমড়ো সাজানো নেই। এর মানে এই বাড়িতে এমন কেউ থাকে যে হ্যালোইন সম্পর্কে জানে না।

তবু দেখি দুটি ছোট ছোট বাচ্চা এসে উপস্থিত। একজন সেজেছে কচ্ছপ অন্য একজন ডাইনী বুড়ি। প্রত্যেকের হাতে চকলেট সংগ্রহের জন্যে তিনটি ব্যাগ। ব্যাগের রং লাল, সাদা এবং সবুজ। ওরা গম্ভীর মুখে বলল– Treat or tricks আমি চকলেট দিলাম। ওরা দু'জন মুখ চাওয়া-চাওয়ি করছে। ছোট জন বলল, কোন রঙের ব্যাগে নিব, সাদাটায়? বড় জন বলল, না লালটায়। জিজ্ঞেস করে জানলাম– সবুজ রঙের ব্যাগে ওরা নেয় পরিচিত মানুষদের দেয়া চকলেট। যাদের খুব ভালো করে চেনে। যাদের অল্প চেনে তাদের চকলেট সাদা রঙের ব্যাগে। যারা একেবারেই অপরিচিত তাদেরগুলি থাকবে লাল রঙের ব্যাগে। এই ব্যাগের চকলেট খাওয়া যাবে না। বাবা-মা'রা প্রথম পরীক্ষা করে দেখবেন। পরীক্ষার পর যদি বলেন– "খাও।" তাহলেই খাওয়া। অধিকাংশ সময়ই খেতে দেন না। ডাস্টবিনে উপুড় করে ফেলে দেন।

এই সাবধানতার কারণ– আমেরিকা হলো বিচিত্র এবং ভয়ংকর মানসিকতার লোকজনদের বাস। সাধারণ মানুষদের মধ্যে লুকিয়ে আছে পিশাচ শ্রেণীর কিছু মানুষ। পাঠক-পাঠিকারা নিশ্চয়ই বিরক্ত হয়ে ভাবছেন পিশাচ শ্রেণীর লোকজন শুধু আমেরিকায় থাকবে কেন? সব দেশেই আছে। ভয়াবহ ক্রাইম তো বাংলাদেশেও হয়। ঐ তো 'বিরজাবালা' পরিবারকে হত্যা করা হলো। যে মানুষটি করল সে কি পিশাচ নয়?

অবশ্যই পিশাচ।

তবে এখানে যেসব কাণ্ডকারখানা হয় তা সব রকম ব্যাখ্যার অতীত। পিশাচরাও এসে লজ্জা পেয়ে যায়।

সম্প্রতি নিউইয়র্কে ঘটে গেছে এমন একটি ঘটনা বলি। ৯১১ নাম্বারে একটি টেলিফোন এলো। এটি পুলিশের নাম্বার। এই নাম্বারে টেলিফোন পেলেই পুলিশ সচকিত হয়ে ওঠে। এক ভদ্রলোক কাঁদতে কাঁদতে টেলিফোন করেছেন। তার শিশু বাচ্চাকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। দোলনায় ঘুমুচ্ছিল– হঠাৎ দেখা গেল সে নেই।

পুলিশ বলল, "তোমার স্ত্রী কোথায়?"

"এইখানেই আছে।"

"তোমরা কি সারাক্ষণ ঘরেই ছিলে?"

"হ্যাঁ ঘরেই ছিলাম। আমি টিভিতে বেইসবল দেখছিলাম। আমার স্ত্রী রান্নাঘরে রান্না করছিল। এক সময় শোবার ঘরে গিয়ে দেখে বাচ্চা নেই।"

"ঘরে আর কেউ ছিল না?"

"না। তবে..."

"তবে কি?"

"আমাদের একটা বিশাল জার্মান শেফার্ড কুকুর আছে। আমার ধারণা..."

"থামলে কেন বলো..."

"আমার ধারণা কুকুরটা বাচ্চাটাকে খেয়ে ফেলেছে।"

"কি বলছ তুমি?"

পুলিশ তৎক্ষণাৎ ছুটে এলো। এক্সরে করে দেখা গেল সত্যিই কুকুরটির পেটে বাচ্চাটির হাড়গোড় দেখা যাচ্ছে। কুকুরকে মেরে তার পেট কেটে হাড়গোড় বের করা হলো। সেই সব পাঠানো হলো পোস্ট মর্টেমের জন্যে।

পোস্ট মর্টেমের রিপোর্টে বলা হলো– হ্যাঁ কুকুর বাচ্চাটিকে খেয়ে ফেলেছে। তবে কামড়ে কামড়ে খায়নি। বাচ্চাটিকে ধারালো ছুরি দিয়ে কুচি কুচি করে কেটে কুকুরটিকে খাওয়ানো হয়েছে।

বাচ্চাটির বাবা তখন অপরাধ স্বীকার করল।

সে বলল– বাচ্চাটি কেঁদে কেঁদে খুব বিরক্ত করছিল। কাজেই সে রাগ করে আছাড় দিয়েছে। এতে বাচ্চাটি মরে গেছে। তখন পুলিশের হাত থেকে বাঁচার জন্যে সে তার স্ত্রীর সঙ্গে পরামর্শ করে তাকে কুচি কুচি করে কেটে কুকুর দিয়ে খাইয়ে ফেলেছে।

বাংলাদেশের পাঠক, পাঠিকা, এমন মানুষ কি আছে আমাদের দেশে?

আরো একটি ঘটনা বলি, এটিও নিউইয়র্কের। একত্রিশ বছর বয়েসি একটি মেয়ে। বাবার সঙ্গে থাকে। কি কারণে বাবার সঙ্গে তার ঝগড়া হলো। বাবা তাকে খুন করে ফেলল। এখানেই ঘটনার শেষ না– ঘটনার শুরু। খুন করার পর সে তার মেয়েকে কেটেকুটে রান্না করে ফেলল। পুলিশ যখন তাকে এসে ধরল তখন সে রান্না করা মেয়েকে খেয়ে প্রায় শেষ করে এনেছে।

এইসব ভয়ংকর অপরাধীদের বিচার কী এদেশে হয় না? অবশ্যই হয়। তবে মৃত্যুদণ্ড প্রায় কখনোই হয় না। সভ্যদেশে মৃত্যুদণ্ড অমানবিক। আমেরিকার অল্প কিছু স্টেট ছাড়া সব স্টেটেই মৃত্যুদণ্ড নেই। সাধারণত জেল হয়। বেশিদিন জেল খাটতেও হয় না। পাঁচ বছর জেল খাটার পর প্যারোলে মুক্তি।

খুনিরা প্যারোলে মুক্তি পেয়ে জেলের বাইরে এসেই আবার খুন করে। ভয়ংকর সব খুনিরা এই দেশে প্রায় 'ন্যাশনাল হিরো'। একজন খুনি তের কি চৌদ্দটা মেয়েকে খুন করে নিজের বাড়ির বেইসমেন্টে পুঁতে রেখেছিল। তাকে

মৃত্যুদণ্ড দেয়া মাত্র হৈচৈ শুরু হয়ে গেল। নাগরিকরা প্ল্যাকার্ড নিয়ে মিছিল বের করল। বর্বর মৃত্যুদণ্ড দেয়া চলবে না। মৃত্যুদণ্ডাদেশ বাতিল কর-ইত্যাদি। একটি সুন্দরী মেয়ে এই খুনির প্রেমে পড়ে গেল। তাদের বিয়েও হয়ে গেল। ন্যাশনাল টিভি খুনির নানান ধরনের ইন্টারভ্যু প্রচার করল। কি বলব এদের?

এরাই যখন আমাদের দেশ নিয়ে নাক সিটকে কথা বলে তখন রাগে গা জ্বলে যায়। জনি কার্সন বলে এক লোক আছে। গভীর রাতে সে টিভিতে 'টক শো' দেয়। অর্থাৎ মজার মজার কথা বলে লোক হাসায়। খুবই জনপ্রিয় অনুষ্ঠান। এই ব্যাটা বদমাশ প্রায়ই বাংলাদেশ নিয়ে রসিকতা করে। এনবিসি টিভিতে একটা রসিকতা করল। আবর্জনা ফেলা নিয়ে রসিকতা। আবর্জনা বোঝাই একটা জাহাজ তখন দু'মাস ধরে সমুদ্রে ঘুরছে। কোনো দেশ সেই জাহাজ বোঝাই আবর্জনা রাখতে রাজি নয়। জনি কার্সন বলল, "এটা নিয়ে সবাই চিন্তিত কেন? আবর্জনা বাংলাদেশে ফেলে দিয়ে এলেই হয়। এরা খুব আগ্রহ করেই আবর্জনা রাখবে।"

রসিকতা শুনে 'টক শোতে' উপস্থিত আমেরিকানরা হাসতে হাসতে ভেঙে পড়ল। বড় মজার রসিকতা।

জনি কার্সন সাহেব, আপনি খুবই রসিক মানুষ কিন্তু দয়া করে জেনে রাখুন— আমরা আমাদের বাচ্চাদের কেটে কুচি কুচি করে কুকুরকে খাইয়ে ফেলি না। আমাদের দেশে কোনো এইডস নেই। সমকামিতা ব্যাপারটি ভয়াবহ ব্যাধি হিসেবে আমাদের দেশে উপস্থিত হয়নি। আমরা অতি দরিদ্র এই কথা সত্যি। দু'বেলা খেতে পারি না এও সত্য। অভাবের কারণে জাল-জুয়াচুরি কেউ কেউ করে, এও সত্য— তবে সঙ্গে সঙ্গে এটাও সত্যি আমরা আমাদের আত্মাকে হারাই নি। আমরা দুঃখে-কষ্টে জীবনযাপন করি এবং এর মধ্যেই আত্মাকে অনুসন্ধান করি। খাঁচার ভেতর যে অচিন পাখি আসা-যাওয়া করে সেই পাখিটাকে বোঝার চেষ্টা করি। বিশ্বাস করুন কার্সন সাহেব আমরা করি।

আমাদের গাড়ির ড্রাইভার এলেকসি— ১৯/২০ বছরের যুবক। আইওয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। এই বয়সে আমেরিকান যুবকরা দৈত্যের মতো বিশাল হয়। এলেকসি সে রকম নয়— শিশু শিশু চেহারা, রোগা-পাতলা। লক্ষ্য করলাম তার

বাঁ কানে দুল। বাঁ কান ফুটা করে দুল পরার ব্যাপারটি এই বয়েস আরো অনেক যুবকদের মধ্যে লক্ষ্য করেছি। নতুন কোনো ফ্যাশান কি? ফ্যাশানের ব্যাপারটি সাধারণত মেয়েদের মধ্যেই লক্ষ্য করা যায়– এবার দেখি ছেলেদেরও ধরেছে। সব ফ্যাশানের 'শানে নজুল' আছে। বাঁ কানে দুল পরার ফ্যাশানের শানে নজুল কি? কয়েকজন আমেরিকানকে জিজ্ঞেস করলাম, কিছু বলতে পারল না। বলতে না পারারই কথা। আমেরিকানদের জিজ্ঞেস করা আর গাছকে জিজ্ঞেস করা একই ব্যাপার। এরা কিছুই জানে না। জানার ব্যাপারে তেমন আগ্রহও নেই।

একজন বলল, কানে দুল পরা এসেছে মিডিল ইস্ট থেকে। মিডিল ইস্ট-এর যাযাবররা কানে দুল পরে।

অন্য একজন বলল, খুব সম্ভব এটা এসেছে রক স্টারদের কাছ থেকে। কোনো একজন রকস্টার হয়তো কানে দুল পরে শো করেছিল এই থেকে চালু হয়ে গেছে। তুমি তো জানোই রকস্টার হচ্ছে আমেরিকান যুবকদের সবচে' বড় আইডল।

তৃতীয় একজন গলার স্বর নিচে নামিয়ে বলল, ওরা হমোসেকচুয়েল। বাঁ কানে দুল হচ্ছে ওদের চিহ্ন। এই দেখে একজন অন্যজনকে চেনে।

এদের কারো কথাই বিশ্বাস হলো না। সরাসরি এলেকসিকে জিজ্ঞেস করলাম। সে হাসি মুখে বলল, "তোমার কি কানে দুল পরা পছন্দ নয়? আমাকে কি ভালো দেখাচ্ছে না?"

"খুবই ভালো দেখাচ্ছে। দুটি কানে পরলে আরো ভালো লাগত। একটি কানে পরায় সিমেট্রি নষ্ট হয়েছে।"

"দু'কানে পরা নিয়ম নয়।"

"নিয়মটা এসেছে কোত্থেকে?"

"জানি না।"

কথা এর বেশি এগুল না। কে জানে সমকামিতার সঙ্গে বাঁ কানে দুল পরার কোনো সম্পর্ক আছে কি-না। থাকতেও পারে।

আমেরিকান সমাজের যে ক'টি ভয়াবহ সমস্যা আছে। সমকামিতা তার একটি। এইডস নামক ভয়াবহ ব্যাধি যার ফসল।

পনেরো বছর আগে লাস ভেগাসে লেবারেচি নামের একজন প্রবাদ পুরুষের একটি শো দেখেছিলাম। ভদ্রলোক হাতের দশ আঙুলে দশটি হীরার আংটি পরে স্টেজে এলেন। কোন আংটি কে তাকে উপহার দিয়েছেন তা বললেন। [একটি ইরানের শাহ, একটি ইংল্যান্ডের রানী–] তারপর নানান রসিতার ফাঁকে ফাঁকে পিয়ানো বাজিয়ে শুনালেন। দু'ঘটার অনুষ্ঠান– দু'ঘণ্টা দর্শকদের মন্ত্রমুগ্ধ করে

রাখলেন। অনুষ্ঠান শেষে তাঁকে স্ট্যান্ডিং ওভেশন দেয়া হলো। সমস্ত দর্শক দাঁড়িয়ে সম্মান জানালেন। আমিও তাদের একজন।

এবার এসে শুনি প্রবাদ পুরুষ লেবারেচি এইডসে মারা গেছেন। ভদ্রলোক ছিলেন সমকামী।

আমি থাকতে থাকতেই বিশ্ব এইডস দিবস উদযাপিত হলো। মিউজিয়ামের পেইন্টিং কাগজ দিয়ে ঢেকে দেয়া হলো। ভাস্কর্য মুড়ে দেয়া হলো কাপড়ে। কারণ এইডস নামক ভয়াবহ ব্যধির প্রধান শিকার– শিল্পী, গায়ক, কবি-সাহিত্যিকরা। সমকামিতার ব্যাপারটি নাকি তাদের মধ্যেই বেশি। ক্রিয়েটিভিটির সঙ্গে যৌন বিকারের কোনো যোগ কি সত্যি আছে?

এই বিষয় নিয়ে লিখতে ভালো লাগছে না। লেখার মতো চমৎকার কোনো বিষয়ও পাচ্ছি না। এখানকার প্রোগ্রামের একটি দিক হচ্ছে– আইওয়াতে যেসব লেখা হয়েছে তার অংশ বিশেষ পাঠ। কিছুই লিখতে না পারার কারণে পাঠ করার মতো কোনো অংশই আমার কাছে নেই। আমি সম্ভবত একমাত্র লেখক যে এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করতে পারবে না।

বিকেলে জামা-কাপড় পরে বের হলাম। পরিকল্পনা করে নিলাম উদ্দেশ্যহীন হাঁটা হাঁটব। পুরোপুরি ক্লান্ত না হওয়া পর্যন্ত থামব না। সঙ্গে ম্যাপ থাকবে যাতে হারিয়ে না যাই। ক্যামেরা সঙ্গে নিতে গিয়েও নিলাম না। ক্যামেরা থাকে ট্যুরিস্টদের হাতে। সুন্দর কোনো দৃশ্য দেখলেই চোখের সামনে ক্যামেরা তুলে ধরে। ছবি তোলা মাত্রই তার কাছে দৃশ্যটির আবেদন শেষ হয়ে যায়। যার হাতে ক্যামেরা থাকে না সে জানে– এই অপূর্ব দৃশ্য সে ধরে রাখতে পারবে না। সে প্রাণভরে দেখার চেষ্টা করে। আমিও তাই করব। প্রাণ ভরে দেখব।

ঘণ্টা খানিক হাঁটার পর মনে হলো শহরের বাইরে চলে এসেছি। একটি বাড়ি থেকে অন্য একটি বাড়ির দূরত্ব খানিকটা বেড়েছে। গাছপালাও মনে হলো বেশি। আবহাওয়াও চমৎকার। শীত সহনীয়। আকাশ পরিষ্কার। সূর্য ডোবার আগের মায়াবী আলো পড়েছে মেপল গাছের পাতায়। আরো খানিকটা এগিয়েই অবাক বিস্ময়ে থমকে দাঁড়ালাম। সামনে সেইন্ট জোসেফ সিমেটিয়ারি। খ্রিস্টান কবরস্থান। বিস্তীর্ণ জায়গা জুড়ে নির্জন কবরখানা। ছোট ছোট নামফলক। বিস্ময়ে অভিভূত হবার কারণ হলো– প্রতিটি নামফলকের সঙ্গে একগুচ্ছ টাটকা ফুল। ফুলে ফুলে পুরো জায়গাটা ঢেকে দেয়া হয়েছে। কত রকমারি ফুল, গোলাপ, টিউলিপ, কসমস, চন্দ্রমল্লিকা, মেরি গোল্ড। দিনের শেষের আলো ফুলগুলিকে শেষবারের মতো ছুঁয়ে যাচ্ছে। এমন সুন্দর দৃশ্য অনেক দিন দেখি নি। হৃদয়

আনন্দে পূর্ণ হলো। আজ আর অন্য কিছু দেখার প্রয়োজন নেই। কিছু সময় কাটিয়ে ফিরে যাওয়া যেতে পারে। ফিরে যেতেও ইচ্ছা করছে না।

ফিরতে ফিরতে সন্ধ্যা মিলিয়ে গেল।

বাড়ির সামনে কালো কোট গায়ে কে যেন দাঁড়িয়ে। অন্ধকারে মুখ দেখা যাচ্ছে না, তবু কেন জানি চেনা চেনা লাগছে। আমি আরো কিছুটা এগিয়ে থমকে দাঁড়ালাম। ছায়ামূর্তি কোমল গলায় বলল, কেমন আছ?

এ কি কাণ্ড- গুলতেকিন দাঁড়িয়ে আছে।

এটা কি স্বপ্ন? চোখের ভুল? কোনো বড় ধরনের ভ্রান্তি!

"কি কথা বলছ না কেন? কেমন আছ?"

"তুমি এইখানে কি ভাবে?"

"আগে বলো তুমি কি আমাকে দেখে খুশি হয়েছ?"

"ব্যাপারটা সত্যি না স্বপ্ন এখনো বুঝতে পারছি না।"

"অনেকক্ষণ বাইরে দাঁড়িয়ে আছি। শীতে জমে যাচ্ছি। দরজা খোলো। কোথায় গিয়েছিলে?"

আমি জীবনে অনেকবার বড় ধরনের বিস্ময়কর ঘটনার মুখোমুখি হয়েছি- কিন্তু এ ধরনের বিস্ময়ের মুকাবিলা করি নি। আমি তৃতীয়বারের মতো বললাম, "এখানে কি করে এলে?"

জানা গেল সে আমাকে অবাক করে দেবার জন্যে এই কাণ্ড করেছে এবং তার জন্যে তাকে খুব বেগ পেতে হয় নি। আমেরিকায় আসবার জন্যে ভিসা চাইতেই ভিসা পেয়েছে। তার নিজস্ব কিছু ফিক্সড ডিপোজিট ছিল, সব ভাংগিয়ে টিকিট কেটে চলে এসেছে। কে বলে মেয়েরা 'অবলা'?

বিস্ময়ের ঘোর কাটাতে অনেক সময় লাগল। গুলতেকিনকে অপরিচিত তরুণীর মতো লাগছে। তার হাত ধরতেও সংকোচ লাগছে। মনে হচ্ছে হাত ধরলেই সে কঠিন গলায় বলবে, একি আপনি আমার হাত ধরছেন কেন?

"বাচ্চারা কেমন আছে গুলতেকিন?"

"ভালোই আছে। তুমি কেমন আছ?"

"ভালো।"

"তুমি চিঠিতে লিখেছিলে বিশাল দোতলা বাড়িতে থাকি- এই বুঝি তোমার বিশাল দোতলা বাড়ি?"

"তোমার কাছে বিশাল মনে হচ্ছে না?"

"হ্যাঁ বিশাল। তবে তোমার চিঠি পড়ে আমি অন্য রকম কল্পনা করে

রেখেছিলাম। তুমি লিখেছিলে তোমার সঙ্গে ফিলিপাইনের এক ঔপন্যাসিক থাকেন। উনি কোথায়?"

"উনি দু'দিনের জন্যে আমানা কলোনিতে গেছেন। চলে আসবেন। তুমি হাত-মুখ ধুয়ে বিশ্রাম করো। আমি রান্না করছি।"

"তুমি রান্না করবে?"

"হ্যাঁ তুমি এখন আমার অতিথি।"

ভাত, গোশত এবং ডাল রান্না করলাম। ভাত গলে গিয়ে জাউয়ের মতো হয়ে গেল। গোশত পুরোপুরি সিদ্ধ হলো না। ডালে লবণ বেশি হয়ে গেল। তাতে কি? সময় এবং পরিস্থিতিতে অখ্যাদ্য খাবারও অমৃতের মতো লাগে। আমি হাই ভি স্টোর থেকে এক প্যাকেট আইসক্রিম এবং দুটো মোমবাতি কিনে নিয়ে এলাম। হোক একটা ক্যান্ডল লাইট ডিনার।

"খেতে কেমন হয়েছে গুলতেকিন?"

"চমৎকার।"

আমি খানিকক্ষণ ইতস্তত করে বললাম, "আচ্ছা গুলতেকিন আমাকে কি তোমার এই মুহূর্তে অপরিচিত কোনো যুবকের মতো লাগছে?"

গুলতেকিন বলল, "অপরিচিত যুবকের মতো লাগবে কেন? তুমি মাঝে মাঝে কি সব অদ্ভুত কথা যে বলো!"

গুলতেকিনকে ঘুরে ঘুরে দেখাব এমন কিছু আইওয়াতে নেই। বড় বড় শপিং মল অবশ্যি আছে, সে সব তো আমেরিকার সব স্টেটেই আছে। বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় কয়েকটি চমৎকার মিউজিয়াম আছে। সেখানে যেতে ইচ্ছা করছে না। দেশের বাইরে গেলে বিশ্ববিদ্যালয়গুলি থেকে দূরে থাকতে চেষ্টা করি।

কিছু দেখার নেই বলে ঘরে চুপচাপ বসে থাকার অর্থ হয় না। পরদিন তাকে নিয়ে বের হলাম। সে বলল, "আমরা কি দেখতে যাচ্ছি?"

"সেইন্ট জোসেফ সিমেটিয়ারি।"

"কবরখানা?"

"হ্যাঁ কবরখানা।"

"তের হাজার মাইল দূর থেকে কবরখানা দেখতে এসেছি?"

"চলো না। তোমার ভালো লাগবে।"

"তোমার রুচির কোনো আগামাথা আমি এখনো বুঝতে পারলাম না। আশ্চর্য।'

"চলো আগে যাই তারপর যা বলবে শুনব। আমার ধারণা তোমার ভালো লাগবেই।"

তার ভালো লাগল। সে মুগ্ধ বিস্ময়ে বলল, "দেখো দেখো প্রতিটি কবরের সামনে, ফুলের গুচ্ছ। এরা কি রোজ এসে ফুল দিয়ে যায়?"

"যায় নিশ্চয়ই। নয়তো ফুল আসবে কোত্থেকে? কিংবা হয়তো কোনো ফুলের দোকানকে বলে দিয়েছে তারা প্রতিদিন ফুল দিয়ে যাচ্ছে।"

"নিশ্চয়ই খুব খরচান্ত ব্যাপার। রোজ একগুচ্ছ ফুল।"

গুলতেকিনের এই কথায় খটকা লাগল। তাই তো– এমন খরচান্ত ব্যাপারে এরা যাবে? মৃতদের প্রতি তাদের কি এতই মমতা? বাবা-মা বুড়ো হলে যারা তাদের ফেলে দিয়ে আসে ওল্ড হোমে...। আমি এগিয়ে গেলাম এবং গভীর দুঃখের সঙ্গে লক্ষ্য করলাম সবই প্লাস্টিকের ফুল। খুবই সুন্দর– আসল-নকলে কোনো ভেদ নেই কিন্তু প্লাস্টিকের তৈরি। একবার এসে রেখে গেছে বছরের পর বছর অবিকৃত আছে। মন খুব খারাপ হয়ে গেল। এই চমৎকার ফুলে ফুলে সাজানো কবরখানা আসলে মেকি ভালোবাসায় ভরা। এরা যখন কোনো মেয়ের সঙ্গে ডেট করতে যায় তখন হাতে এক গুচ্ছ ফুল নিয়ে যায়। সেই ফুল আসল ফুল। প্লাস্টিকের ফুল নয় কিন্তু মৃতদেহের বেলায় কেন প্লাস্টিকের ফুল? আমার মনটাই খারাপ হয়ে গেল।

পনেরো দিনের একটি ট্যুর প্রোগ্রামের শেষে লেখক সম্মেলনের ইতি। ট্যুর প্রোগ্রামটি চমৎকার। এই পনেরো দিনে লেখকরা যে যেখানে যেতে চান সেই ব্যবস্থা আমেরিকান ইনফরমেশন সার্ভিস করবে। টিকিট কেটে দেবে, আগেভাগে হোটেলের ব্যবস্থা করে রাখবে। মোটামুটি রাজকীয় ব্যবস্থা বলা যেতে পারে।

আমি যেসব জায়গায় যেতে চেয়েছি সেগুলি হচ্ছে সানফ্রান্সিসকো, নিউ অর্লিন্স এবং নিউইয়র্ক। সানফ্রান্সিসকো পছন্দ করার কারণ ঔপন্যাসিক স্টেইনবেক সানফ্রান্সিসকোর মানুষ। তাঁর বেশিরভাগ উপন্যাসের পটভূমি সেলিনাস ভেলি। নিউ অর্লিন্স পছন্দ করার কারণ– সেখানকার ফ্রেঞ্চ কোয়ার্টার। ফ্রেঞ্চ কোয়ার্টারে উইলিয়াম ফকনার প্রথম উপন্যাস লেখা শুরু করেন। ও হেনরির লেখক জীবনও শুরু হয় এইখানে। টেনেসি উইলিয়মসের বিখ্যাত লেখা A street car named desire লেখা হয় নিউ অর্লিন্সের ফ্রেঞ্চ কোয়ার্টারে। এই

ফ্রেঞ্চ কোয়ার্টারেই আংকেল টমস কেবিন উপন্যাসটির অকসান হয়। কাজেই অতি বিখ্যাত এই জায়গাটি সম্পর্কে আমার কৌতূহল হওয়া স্বাভাবিক।

মুশকিল হলো গুলতেকিনকে নিয়ে। তার টিকিট কাটতে হবে আমাকে। সেটা কোনো সমস্যা নয়, সমস্যা হলো টিকিট পাওয়া নিয়ে। অনেক কষ্টে আইওয়া থেকে সানফ্রান্সিসকোর ট্রেনের টিকিট পাওয়া গেল। ট্রেনের টিকিট পাওয়া যায়। আমেরিকানরা ট্রেনের ভক্ত নয়। সমস্যা হলো বিমানের টিকিট নিয়ে তার জন্যে বাকি টিকিট পাওয়া গেল না। ঠিক করলাম সে সানফ্রান্সিসকোয় পাঁচ দিন থেকে চলে যাবে নিউজার্সিতে ওখানকার টিকিট পাওয়া যাচ্ছে। সে সেখানেই আমার জন্যে অপেক্ষা করবে। আমি আমার প্রোগ্রাম শেষ করে তার সঙ্গে যোগ দেব এবং তাকে নিয়ে ওয়াশিংটন ডিসিতে বেড়াতে যাব।

এই পরিকল্পনা তার যে খুব পছন্দ হলো তা না কিন্তু এর বেশি তো কিছু করার নেই।

আমার ভ্রমণ পরিকল্পনা শুধু তার না অনেকেরই পছন্দ হলো না। যেই শুনে সেই বলে তুমি দু'হাজার মাইল রাস্তা যাবে ট্রেনে করে? তোমার কি মাথাটা খারাপ হলো? আমেরিকান ট্রেনের সেই রমরমা এখন নেই। এমট্রেকের নাভিশ্বাস উঠেছে। দু'দিন দু'রাত ট্রেনে থেকে বিরক্তিতেই তুমি মারা যাবে। খুবই অব্যবস্থা।

সবার কথা শুনে শুনে আমারও ধারণা হলো ভুলই বুঝি করলাম। দু'দিন দু'রাত ট্রেনে কাটানো সহজ কথা না। অথচ শুরুতে ভেবেছি চারপাশের দৃশ্য দেখতে দেখতে যাব। ট্রেনের কামরা থেকে আমেরিকার একটা বড় অংশ দেখা হয়ে যাবে। গুলতেকিন বলল, "আমেরিকান ট্রেনের জানালা খুলা যায়?"

আমি বললাম, "মনে হয় না। শীতের সময় জানালা খুলবে কি ভাবে?"

"তাহলে আমরা শুধু শুধু ট্রেনে যাচ্ছি কেন? বন্ধ জানালার ভেতর দিয়ে কি দেখব? কাচের ভেতর দিয়ে কিছু দেখতে আমার ভালো লাগে না।"

"আমারও ভালো লাগে না। কিন্তু উপায় নেই, টিকিট কাটা হয়ে গেছে।"

"দয়া করে স্বীকার করো যে আবার একটা ভুল করেছ। তোমার কি উচিত না এইসব পরিকল্পনা করার আগে দশ জনের সঙ্গে কথা বলে জেনে নেয়া?"

"খুবই উচিত?"

যথা সময়ে আমরা ট্রেনে উঠলাম। গুলতেকিনের গম্ভীর মুখ ট্রেনে উঠেই পাল্টে গেল। সে পরপর তিন বার বলল– "চমৎকার!"

এ্যামট্রেক দোতলা ট্রেন। একতলায় টয়লেট, মালপত্র রাখার জায়গা। দু'তলায় বসার ব্যবস্থা। ট্রেনের দুটি বিশাল কামরা হলো অবজারভেশন ডেক।

পুরো দেয়াল কাচের। ভেতরে রিভলবিং চেয়ার। এখানে বসে চারপাশের দৃশ্য দেখতে দেখতে যাওয়া যায়।

জোসনা রাত। আকাশে পূর্ণিমার চাঁদ। আমরা দু'জন অবজারভেশন ডেকে বসে আছি। প্রেইরি প্রান্তর ভেদ করে ট্রেন ছুটে চলছে। তিনটি ইঞ্জিন ট্রেনকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। গুলতেকিন বলল, "আমার মনে হচ্ছে এ জীবনে মনে রাখার মতো যা কিছু অভিজ্ঞতা আমার আছে– এই ট্রেন ভ্রমণ হবে তার একটি।"

আমি বললাম, "আমারো তাই ধারণা।"

সে লাজুক স্বরে বলল– "আমি লক্ষ্য করেছি মাঝে মাঝে তুমি কোনো রকম চিন্তাভাবনা না করে একটা কাণ্ড করে বসো। যার ফল আবার কি করে কি করে যেন খুব ভালো হয়ে যায়। ভাগ্যিস তুমি কারো কথা না শুনে ট্রেনের টিকিট কেটেছিলে।"

ট্রেন ঝড়ের গতিতে ছুটে চলেছে। কামরায় গাড়ি ভরা ঘুম রজনী নিঝুম। আমরা দু'জনে চুপচাপ বসে আছি। চোখের সামনে আদিগন্ত বিস্তৃত মাঠ। মাঠের উপর ফিনিক ফোটা জোছনা।

ভোরবেলা দৃশ্যটাই বদলে গেল। ট্রেন ঢুকল রকি পর্বতমালায়। পাহাড় কেটে কেটে ট্রেন লাইন বসানো হয়েছে। কখনো ট্রেন ঢুকছে সুরঙ্গে কখনো ট্রেন গভীর গিরিপর্বত পাশ কাটিয়ে যাচ্ছে। নিচের দিকে তাকালে মাথা ঘুরে যায়। পাহাড়গুলিরইবা কি শোভা। মাথায় বরফের চাদর। পাহাড়ের শরীরে পাইন গাছের চাদর।

ট্রেন লাইনের পাশে পাশেই আছে পাহাড়ি কলারাডো নদী। সে দু'শ সত্তর মাইল আমাদের পাশে পাশে রইল। কি স্বচ্ছ তার পানি। ঘন নীল আকাশের ছায়া পড়েছে তার গায়ে। পাহাড় ভেঙে নদী চলছে আপন গতিতে। আমার কেবলি মনে হতে লাগল, ইস যদি ঐ পানি ছুঁয়ে দেখতে পারতাম।

মাঝে মাঝে পাহাড়ের গায়ে বাড়িঘর দেখা যাচ্ছে। একটা লাল ইটের বাড়ি দেখলাম। ছবির বাড়িও এত সুন্দর থাকে না। আকাশের মেঘ ঐ বাড়ি ছুঁয়ে ছুঁয়ে যাচ্ছে। বাড়ির উঠোনে কালো রঙের একটা ঘোড়া। লাল স্কার্ফ মাথায় জড়িয়ে বাচ্চা একটা মেয়ে দৌড়াচ্ছে। আহা তারা কি সুখেই না আছে! যদি এমন একটা বাড়ি আমার থাকত!

অন্ধকার গুহা থেকে বের হয়ে ট্রেন একবার চলে এল ফুলে ফুলে ভরা এক ভ্যালিতে– খুব পরিচিত ফুল, কাশ ফুল। চেনা ফুল অচেনা জায়গায়। কিছু নাম না জানা ফুলও আছে। কি ভালোই না লাগছে দেখতে।

I offen see flowers from a passing car
That are gone before I can tell what they are.
I want to get out of the train and go back
To see what they were beside the track...
Heaven gives its glimses only to those
Not in position to look too close
(Robert Frost)

সানফ্রান্সিসকোতে আমাদের থাকার জায়গা ডাউন টাউনের বড় একটা হোটেলে। হোটেল বেডফোর্ড। চায়না টাউনের পাশে আকাশ ছোঁয়া বাড়ি। ঘুরে বেড়ানোয় গুলতেকিনের খুব আগ্রহ। সে ট্যুরিস্টদের কাগজপত্র ঘেঁটে নানান জায়গা বের করছে যা আমরা দেখব।

ফিশারম্যান ওয়ারফ
গোল্ডেন গেট
মুর উডস
নাপা ভ্যালি
ক্রুকেড স্ট্রিট

ফিশারম্যান ওয়ারফ প্রথম দেখতে গেলাম। আমেরিকান জেলে পল্লী। আহামরি কিছু নয়– বাংলাদেশের সদরঘাট। অসংখ্য ছোট ছোট মাছ ধরার বোট। খাবারের দোকান-এর বেশি কিছু না। ট্যুরিস্টরা মহানন্দে তাই দেখছে এবং পটাপট ছবি তুলছে। আমি মুগ্ধ এবং বিস্মিত হবার কিছুই পাচ্ছি না। অবশ্যি দুটি সিল মাছ কিছুক্ষণ পরপর মাথা তুলে বিকট শব্দ করছে। এই দৃশ্যটি খানিকটা আকৃষ্ট করল।

একটি ছবি তোলার পর সেই দৃশ্যের আবেদনও ফুরিয়ে গেল। আমি বললাম, "গুলতেকিন হোটেলে ফিরে গেলে কেমন হয়?" সে অত্যন্ত আহত হলো বলে মনে হলো। তীক্ষ্ণ গলায় বলল, "হোটেলে ফিরে যাব মানে? হোটেলেই যদি বসে থাকবে তাহলে বেড়াতে আসার মানে কি?"

"আমি তো আর দেখার মতো কিছু পাচ্ছি না।"

"তুমি দেখার মতো কিছু পাচ্ছ না তাহলে হাজার হাজার ট্যুরিস্ট কি দেখছে?"

ট্যুরিস্টরা কি দেখছে সেও এক রহস্য। হাজার হাজার ট্যুরিস্ট ক্যামেরা কাঁধে মুগ্ধ চোখে ঘুরছে। তাদের দেখে মনে হচ্ছে বিস্ময় ও আনন্দে তারা অভিভূত। আমি অবাক হয়ে ভাবছি আনন্দ পাবার চমৎকার অভিনয় তারা কার জন্য করছে? নিজের জন্যে? কেন করছে?

গুলতেকিনকে খুশি করার জন্যে একটা ওয়াক্স মিউজিয়ামে ঢুকলাম। লন্ডনের মাদাম তুষোর ওয়াক্স মিউজিয়ামের নামডাক শুনেছি- দেখি এদেরটা কেমন। টিকিটের দাম ষোল ডলার। খুব খারাপ হবার কথা না। মাবুদে এলাহী, কিছুই নেই ভেতরে। ক্লিওপেট্রা নাম দিয়ে যে মূর্তি বানিয়ে রেখেছে তাকে দেখাচ্ছে ফর্সা বাঁদরের মতো। এক জায়গায় দেখলাম প্রেসিডেন্ট বুশকে বানিয়েছে, দেখাচ্ছে কংকালের মতো। হাঁ করে আছে- মনে হচ্ছে কামড় দিতে আসছে। আমি মিউজিয়ামের একজন কর্মকতাকে বিনীত ভঙ্গিতে বললাম- "এটা কি প্রেসিডেন্ট বুশের কংকাল?"

সে খুব আহত হলো বলে মনে হলো না। তার মানে আমার মতো আরো অনেকেই তাকে এই প্রশ্ন করেছে।

বিকেলে ক্লান্ত ও বিরক্ত হয়ে হোটেলে ফিরলাম। গুলতেকিন বলল, "এখন কি করা যায়?" আমি বললাম, "খানিকক্ষণ ঝগড়া করলে কেমন হয়?"

"তার মানে?"

"বাসায় বাচ্চারা থাকে প্রাণখুলে ঝগড়া করা যায় না- এখানে চমৎকার নিরিবিলি। এসো দরজা বন্ধ করে প্রাণ খুলে ঝগড়া করে নেই।"

পরদিন ভোরবেলা একজন এসকর্ট এসে উপস্থিত। ভদ্রলোক বিমানবাহিনীর অবসরপ্রাপ্ত কর্নেল। বিদেশী অতিথিদের নিজের সাথেই ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে সানফ্রান্সিসকো দেখান। তাকে নাকি ওয়াশিংটন থেকে বলা হয়েছে আমাদের সঙ্গ দেবার জন্যে। বেশ উৎসাহ নিয়েই আমরা তাঁর সঙ্গে বের হলাম। তিনি বিশাল গাড়ি নিয়ে এসেছেন। বেশ হাসি-খুশি ধরনের মানুষ। সানফ্রান্সিসকোর নাড়ি-নক্ষত্র জানেন।

কিছুক্ষণের মধ্যেই লক্ষ্য করলাম ভদ্রলোক কথা না বলে থাকতে পারেন না। অনর্গল কথা বলেন। গলার স্বরে কোনো উঠানামা নেই। কথা বলার সময় অন্যরা কি ভাবছে কি বলছে কিছুই লক্ষ করেন না। প্রথম শ্রেণীর একজন রবট। আমার মাথা ধরে গেল। এ কি যন্ত্রণা!

সবচে' বিরক্তিকর ব্যাপার হলো ভদ্রলোক এমন ভঙ্গিতে কথা বলছেন যেন আমি আফ্রিকার গহিন অরণ্য থেকে এই প্রথম শার্ট-প্যান্ট গায়ে দিয়ে সভ্য সমাজে এসেছি। আমি এক ফাঁকে গুলতেকিনকে বললাম- "এই ব্যাটাকে তো আর সহ্য করা যাচ্ছে না, কি করা যায় বলো তো?"

সে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বলল, মাথার যন্ত্রণায় আমি মরে যাচ্ছি, কিছু একটা করো। আর পারছি না।

আমি এই বিপদ থেকে কি করে উদ্ধার পাওয়া যায় কিছুতেই বুঝতে পারছি না। ভদ্রলোক এর মধ্যে কয়েক বারই বলেছেন তিনি আমাদের নিয়ে সন্ধ্যা পর্যন্ত ঘুরবেন। সন্ধ্যা পর্যন্ত তাঁর সঙ্গে থাকলে বিরক্তিতেই মৃত্যু হওয়া বিচিত্র না। মুক্তির সুযোগ ভদ্রলোক নিজেই করে দিলেন। এক সময় বললেন, "ভিয়েতনামের যুদ্ধে আমি বি ফিফটি টু বিমান চালাতাম। দু'বার আমাকে প্যারাস্যুট দিয়ে জাম্প করতে হয়েছিল। হোয়াট এন এক্সপেরিয়েন্স।"

আমি বললাম, "বি ফিফটি টু বিমান। তার মানে বোমারু বিমান?"

"হ্যাঁ"।

"ভিয়েতনামে ভারী ভারী বোমার বেশ কিছু তাহলে তুমি ফেলেছ।"

"হ্যাঁ। এটা হচ্ছে পার্ট অব দি গেম।"

"তাহলে তো একটা সমস্যা হলো।"

"কি সমস্যা?"

"তুমি অনেক নিরীহ মানুষের মৃত্যুর জন্যে পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষভাবে দায়ী। আর এদিকে আমি একজন অনুভূতি প্রবণ লেখক। তোমার সঙ্গে থাকা তো আমার পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না। আমার মনের ওপর চাপ পড়ছে। তুমি কি দয়া করে আমাকে এবং আমার স্ত্রীকে হোটেলে পৌঁছে দেবে?"

ভদ্রলোক চোখে রাজ্যের বিস্ময় নিয়ে বললেন, "তুমি হোটেলে ফিরে যেতে চাচ্ছ?"

আমি সহজ গলায় বললাম, "হ্যাঁ। আমাদের হোটেলে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে তোমার যদি অসুবিধা থাকে এখানেই নামিয়ে দাও। আমরা ট্যাক্সি ভাড়া করে চলে যাব।"

"না অসুবিধা নেই। চলো হোটেলে পৌঁছে দিচ্ছি।"

গুলতেকিন বলল, "তুমি এমন একটা কথা এ রকম কঠিনভাবে কি করে বললে?"

আমি বললাম, "আমেরিকানরা সরাসরি কথা বলা পছন্দ করে। ওরা যা বলার সরাসরি বলে। আমিও তাই করলাম।"

সানফ্রান্সিসকো ঘুরে দেখার কাজ দু'জনে হাত ধরাধরি করে হেঁটে হেঁটেই সারলাম। খুব মজা লাগল চায়না টাউন দেখে। শহরের বিরাট একটা অংশ– সব চৈনিক। দোকানের সাইনবোর্ডগুলি পর্যন্ত চীনা ভাষায় লেখা। হাজার হাজার নাক চাপা লোক ঘুরে বেড়াচ্ছে। অবস্থা অনেকটা আমাদের দেশের হাটের মতো। দরদাম হচ্ছে। যার দাম শুরুতে কুড়ি ডলার হাঁকা হয়েছিল তা শেষ পর্যন্ত বিক্রি

হচ্ছে সাত ডলারে। আমেরিকায় এই ব্যাপারটি অকল্পনীয়। দরদাম করার ব্যবস্থা আছে দেখে গুলতেকিন খুবই উৎসাহ পেয়ে গেল। তার এই উৎসাহের কারণে এক গাদা অপ্রয়োজনীয় জিনিস আমরা চায়না টাউন থেকে কিনে ফেললাম।

চায়না টাউনের এক অংশে আছে প্রাপ্তবয়স্কদের জন্যে আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থা। ভেতরে কি হয় না হয় জানি না– বাইরে কিছু সাইন বোর্ড থেকে কিছুটা আঁচ করা যায়। নমুনা দিচ্ছি–

"রোজিস প্লেস, অনিন্দ্য সুন্দরী নর্তকীরা নগ্ন গায়ে নৃত্য করবে। উপস্থিত অতিথিদের সবার টেবিলের উপরও তারা নাচবে।"

"মাত্র দশ ফুট দূরে দাঁড়িয়ে থাকা সম্পূর্ণ নগ্ন তরুণীর সঙ্গে একান্ত কথা বলার সুযোগ। প্রতি মিনিট কথা বলার জন্যে এক ডলার পঞ্চাশ সেন্ট।"

এই ব্যাপার আমেরিকার অনেক শহরে দেখেছি। এসব ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে কোনো বাধা-নিষেধ হয়তো নেই। ফ্রি কান্ট্রি– যার যা ইচ্ছা করতে পারে। যতদূর জানতাম নেভাদা স্ট্রেট ছাড়া অন্য কোনো স্ট্রেটে বেশ্যাবৃত্তির আইন সিদ্ধ নয়– সানফ্রান্সিসকোতে সন্ধ্যার পর পথে অনেক নিশিকন্যাকেই দেখা গেল। উগ্র প্রসাধন, তার চেয়ে উগ্র পোশাক। একেক জনের চেহারা এত সুন্দর যে ইচ্ছা করে কাছে গিয়ে আশা ও আনন্দের দু'একটা কথা বলি। ওদের বলি, পৃথিবীকে এই মুহূর্তে তাদের যত খারাপ লাগছে আসলে তত খারাপ নয়। এইসব নিশিকন্যাদের দেখলেই আমি নিজের ভেতর এক ধরনের বিষণ্নতা অনুভব করি। এই বিষণ্নতার জন্ম কোথায় আমি জানি না।

এই বিরাট শহরে প্রচুর গৃহহীন মানুষ দেখলাম। সাইন বোর্ড নিয়ে রাস্তায় মোড়ে মোড়ে বসে আছে।

"আমি গৃহহীন আমাকে সাহায্য দাও।"

আমাদের দেশের মতো দরিদ্র কৃষক যেমন ভূমিহীন হচ্ছে– এখানকার হতদরিদ্র আমেরিকানরা হচ্ছে গৃহহীন। একটি বাড়ি (নিজের বা ভাড়া) এ দেশে টিকিয়ে রাখা কষ্টকর। গত নভেম্বর (৯০) নিউইয়র্ক টাইমস-এ প্রকাশিত একটি প্রতিবেদনের কথা বলি। নিউইয়র্কবাসী বৃদ্ধ এক আমেরিকানের স্বপ্নের কথা এই প্রতিবেদনে বলা হচ্ছে। এই আমেরিকান বৃদ্ধ বয়সে সোস্যাল সিকিউরিটি থেকে চারশত সত্তর ডলার পান। চারশ' ডলার চলে যায় তার এক রুমের কামরার ভাড়া বাবদ। সত্তর ডলারে বাকি মাস টেনে নিতে হয়। রাত এবং দুপুরে খাবারের জন্যে একটা রেস্টুরেন্টে যান। রেস্টুরেন্টে খদ্দেরের উচ্ছিষ্ট খাবার তাকে দেয়া হয়। সেই ব্যবস্থা করা আছে। কাজেই দু'বেলা খাবারের খরচ বেঁচে যায়। তাঁর একটা কফি

মেশিন আছে। মাঝে মাঝে সেই কফি মেশিনে কফি বানিয়ে খান। ছেলে- মেয়েরা বড় হয়েছে। তাদের অনেকেরই ছেলেপুলে আছে। কারো সঙ্গেই এই বৃদ্ধের যোগাযোগ নেই। কারণ যোগাযোগ থাকলেই বিভিন্ন উপলক্ষে গিফট পাঠাতে হবে। সেই সামর্থ্য তাঁর নেই। এই বৃদ্ধ তাঁর বর্তমান জীবন নিয়ে সুখী কারণ তিনি গৃহহীন নন। একটা ছোট্টঘর তাঁর আছে। শীতের রাতে যে ঘরে তিনি আরাম করে ঘুমুতে পারেন। পার্কের বেঞ্চিতে, বসে তাঁকে রাত কাটাতে হয় না। কাজেই তিনি ভাগ্যবান।

এক রাতে গুলতেকিনকে নিয়ে রাস্তায় রাস্তায় হাঁটছি। গ্রামোফোন রেকর্ডের দোকান দেখলেই থামছি, যদি ভালো এলপি পাই কিনে নেব। পাচ্ছি না। এলপি উঠে গেছে, তার জায়গায় এসেছে CD প্লেয়ার। এক দোকানে আমার পছন্দের কিছু ক্যাসেট পেলাম। কিংস্টোন ট্রায়োর "Where have all the flowers gone...' মন খারাপ করা গান। দু'জনে হাত ধরাধরি করে বাসায় ফিরছি। মনের ভেতরে গান বাজছে। শহরটা হয়ে গেছে অন্য রকম। এই রহস্যময় সময়ে হঠাৎ থমকে দাঁড়াতে হলো– অত্যন্ত রূপবতী এক তরুণী তার শিশুপুত্রকে কোলে নিয়ে রাস্তার পাশে বসে আছে। তাদের সামনে কাঠ বোর্ডের একটি কাগজে লেখা– আমি এবং আমার শিশুপুত্র গৃহহীন। আপনার থলেতে কি কিছু ভাংতি পয়সা আছে?

মেয়েটির বয়স খুব বেশি হলে আঠারো-উনিশ। চোখ ধাঁধানো রূপ। তার ঘুমন্ত শিশুটিও মায়ের রূপের সবটুকু নিয়ে পৃথিবীতে এসেছে। গুলতেকিন বিষণ্ণ গলায় বলল, এ কি। সে পাঁচ ডলারের একটি নোট নিয়ে এগিয়ে গেল। আমি দূরে দাঁড়িয়ে রইলাম। এমন রূপবতী একজনকে কেউ ভিক্ষা দিচ্ছে এই কষ্ট আমার পক্ষে সহ্য করা সম্ভব নয়। কি দেখছি আজকের আমেরিকায় "Where have all the flowers gone..." ।

সানফ্রান্সিসকো থাকার কাল শেষ হয়েছে, এখন যাচ্ছি নিউ অরলিন্স। গুলতেকিন আমার সঙ্গে যেতে পারছে না– তার টিকিট পাইনি। সে চলে যাবে নিউ জার্সি। আমার জন্যে সেখানেই অপেক্ষা করবে। আমি নিউ অরলিন্সে এক সপ্তাহ কাটিয়ে চলে যাব তার কাছে।

আমি তাকে এয়ারপোর্টে তুলে দিতে এলাম। খুবই খারাপ লাগছে। মনে হচ্ছে- শেষ বিদায় দিতে এসেছি। আর দেখা হবে না। তার স্যুটকেস চেক ইন করে দিয়েছি- সে ঢুকবে সিকিউরিটি এলাকায়। খুব মন খারাপ করা মুহূর্ত। এই মুহূর্তে হঠাৎ আমাকে বিস্মিত করে দিয়ে সে বলল, "আমার এদেশের একটা জিনিস খুব ভালো লাগে। বিদায় মুহূর্তে এদের স্বামী-স্ত্রীরা কি সুন্দর শালীন ভঙ্গিতে চুমু খায়। তোমার কি এই দৃশ্য দেখতে ভালো লাগে না?"

আমি বললাম, "হ্যাঁ ভালো লাগে।"

"আমার সব সময় মনের মধ্যে গোপন বাসনা ছিল-

গুলতেকিন তার কথা শেষ করল না। ক্লান্ত ভঙ্গিতে সিকিউরিটি এলাকায় ঢুকে গেল। আমি মন খারাপ করে নিউ অরলিন্স রওনা হলাম। মন খারাপ হলেই আমার শরীর খারাপ করে। প্লেনে ওঠার পর পর মাথার যন্ত্রণা শুরু হলো। এক সময় দেখি নিঃশ্বাসে কষ্ট হচ্ছে।

নিউ অরলিন্সের ফ্রেঞ্চ কোয়ার্টারের চমৎকার একটি হোটেলের তিনতলায় এক সপ্তাহ কাটিয়ে দিলাম। একবারও ইচ্ছা করল না শহরটা কেমন ঘুরে দেখি। ফ্রেঞ্চ কোয়ার্টার ব্যাপারটা কি? কি বিশেষত্ব এই জায়গায় যে আমেরিকান সমস্ত প্রধান লেখকরাই তাদের জীবনের একটা বড় অংশ এখানে কাটিয়েছেন? কি আছে এখানে? হোটেলের বিছানায় শুয়ে শুয়ে ফ্রেঞ্চ কোয়ার্টারের আনন্দ ও উল্লাস ধ্বনি শুনি। পথে পথে হৈচৈ হচ্ছে। জ্যাজ সঙ্গীত হচ্ছে। নাচ হচ্ছে। প্রতিটি কাফে সারারাত খোলা। বার খোলা। মনে হয় এই পৃথিবীতে কোনো দুঃখ নেই।

আমি ফ্রেঞ্চ কোয়ার্টারের মতো মজাদার জায়গায় অসুস্থ হয়ে পড়ে আছি এই খবর রটে গেল। আমার সঙ্গী লেখকরা সব সময় খোঁজখবর নিতে আসছেন। পঁয়তাল্লিশ জন লেখকদের সবাই এখানে এসেছেন। তাঁরা এক ধরনের দায়িত্ববোধ করছেন- বাংলাদেশী ঔপন্যাসিকের কি হলো খোঁজ নেয়া। খুবই বিরক্তিকর অবস্থা। অবশ্য তাঁদের কাছ থেকে কিছু মজার মজার খবরও পাচ্ছি। যেমন ভারতীয় মহিলা কবি গগন গিল ডলার বাঁচানোর জন্যে আলজেরীয় নাট্যকারের সঙ্গে একটা রুম শেয়ার করছেন। একজন অল্পবয়স্কা ভারতীয় মহিলা এ রকম করবেন তা সহজভাবে গ্রহণ করতে একটু বোধহয় কষ্ট হয়। দেখলাম লেখকদের কেউই ব্যাপারটা সহজভাবে নিতে পারে নি।

পশ্চিম দেশীয় কোনো তরুণী শয্যাসঙ্গী হিসেবে অল্প পরিচিত কোনো পুরুষকে গ্রহণ করতে হয়তো আপত্তি করবে না। কিন্তু রাতে ঘুমুবার জন্যে একটি আলাদা ঘর চাইবে, প্রাইভেসি চাইবে। যাক এসব ক্ষুদ্রতা, অন্য কথা বলি- নিউ

অরলিন্সের হোটেল বরবনে রাত্রিবাস আমার একেবারে বৃথা গেল না– মে ফ্লাওয়ার এখানেই লেখা শুরু করলাম। শারীরিক অসুস্থতা ভুলে থাকার এই একটি চমৎকার উপায় লেখালেখিতে নিজেকে ব্যস্ত করে ফেলা। তাই করলাম। দরজা বন্ধ করে সারাদিন লেখার পর দেখি শরীরের ঘোর কেটে গেছে। ক্ষুধা বোধ হচ্ছে।

রুম সার্ভিসকে কফি এবং খবরের কাগজ দিতে বলেছি। সে নিউইয়র্ক টাইমস দিয়ে গেল। অবাক হয়ে দেখি নিউইয়র্ক টাইমস-এর শেষ পাতায়-বাংলাদেশ সম্পর্কে একটা খবর ছাপা হয়েছে। জনতার প্রবল দাবির মুখে প্রেসিডেন্ট এরশাদ পদত্যাগ করেছেন। বর্তমানে তাঁর পালক পুত্র এবং পালক কন্যাসহ গৃহবন্দি আছেন।

বাংলাদেশে কি হচ্ছে না হচ্ছে কিছুই জানতাম না। এই খবরে বিস্ময়ের সীমা রইল না। এত বড় একটা খবর অথচ আমেরিকান পত্রিকায় এত ছোট করে ছাপা হয়েছে দেখেও খারাপ লাগল। ছাত্ররা এত ক্ষমতাবান একজন ডিক্টেটরকে সিংহাসন থেকে নামিয়ে ফেলেছে– এই ঘটনা চীনের থিয়েনমেন স্কয়ারের চেয়ে কোনো অংশেই কম গুরুত্বপূর্ণ নয় অথচ কত হেলাফেলার সঙ্গেই না খবরটা এরা ছাপাল। এরশাদের যে একজন পালক কন্যাও ছিল তা জানতাম না– নিউইয়র্ক টাইমসের কল্যাণে জানলাম। পালক পুত্রটির ছবি লক্ষ বার দেখেছি। পালক কন্যাকে কোনোদিন দেখিনি। এরশাদ নিশ্চয় বলে নি মেয়েটির ছবি ছাপা হোক। তাকে সবাই দেখুক।

কেন জানি ঐ পালক কন্যাটি খুব দেখতে ইচ্ছা করছে। কেমন দেখতে ঐ মেয়েটি? কি তার নাম?

নিউ জার্সি শহরে আড়াইশ'র মতো বাঙালির বাস।

এই আড়াইশ'র একজন আমার ছোট ভাই মুহম্মদ জাফর ইকবাল। কাজ করে বেল ল্যাবরেটরিতে। নিউক্লিয়ার ফিজিসিস্ট। গবেষণার বিষয় ফাইবার অপটিকস বা এই ধরনের কিছু। তারচেয়ে বড় পরিচয় সে বাংলা সাহিত্যের একজন লেখক এবং উঁচুমানের লেখক। তাঁর বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনী এবং শিশুদের জন্যে লেখা গ্রন্থগুলি আমি মুগ্ধ বিস্ময়ে পড়ি, মাঝে মাঝে খানিকটা ঈর্ষাও যে করি না তা না।

নিউ অরলিন্স থেকে সরাসরি তার বাসায় গিয়ে উঠলাম। তার দুই বাচ্চা- নাবিল এবং ইয়েসিম। দু'জনই এয়ারপোর্টে খুব আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষা করছিল- বড় চাচা আসবেন। তাদের ধারণা বড় চাচা মানে সাইজে যিনি বড়। দু'জনই আমার আকৃতি দেখে মনোক্ষুণ্ন হলো। নাবিল নিখুঁত ইংরেজিতে বলল, "তোমরা একে বড় চাচা কেন বলছ- He is small."

নাবিলের বয়স পাঁচ। ইংরেজি-বাংলা দুই-ই চমৎকার বলে। তার বোনের বয়স তিন, সে মিশ্র ভাষা ব্যবহার করে। উদাহরণ- "Give my জামা খুলি" অর্থাৎ আমার জামা খুলে দাও।

বাচ্চা দুটি একা একা থাকে। নিকট আত্মীয়স্বজনদের দেখা বড় একটা পায় না। আমাকে এবং গুলতেকিনকে পেয়ে তাদের আনন্দের সীমা রইল না। তাদের আগ্রহ ও আনন্দের প্রধান কারণ আমরা বাংলাদেশের। বাচ্চা দুটিকে তাদের বাবা-মা এমন এক ধারণা দিয়েছে যাতে তাদের কাছে বাংলাদেশ হচ্ছে স্বপ্নের দেশ। বাংলাদেশের মানুষ- স্বপ্নের মানুষ। আমি তাদের সেই ধারণা উসকে দেবার প্রাণপণ চেষ্টা করলাম। ইয়েসিম যখন তার রান্নাবাটি খেলার কাগজের খাবার আমাকে এনে দিল আমি কপ কপ করে সেই কাগজ খেয়ে দুই ভাই-বোনের মনে বিস্ময়ের সৃষ্টি করলাম।

ওদের বাবা-মা দেখি বাচ্চা দুটিকে খুবই আধুনিক নিয়মে বড় করার চেষ্টা করছে। বাবা-মা দু'জনই পিএইচডি ডিগ্রিধারী এবং দীর্ঘদিন আমেরিকা প্রবাসী হলে এই বোধহয় হয়। ঘরে বাচ্চাদের জন্যে আইন-কানুন লেখা। যেমন-

প্রথম আইন : কাঁদলে কোনো জিনিস পাওয়া যাবে না। কাজেই কেঁদে লাভ নেই।

দ্বিতীয় আইন : খেলনা কারোর একার নয়। খেলনা শেয়ার করতেই হবে।

আমি ইকবালকে বললাম, "তোর কায়দা-কানুন তো কিছুই বুঝতে পারছি না। কোনো একটা কিছু নিয়ে কেঁদে বাড়ি মাথায় না তুললে আর বাচ্চা কি! তোর নিয়মে তুই তো বাচ্চাদের বড়ো বানিয়ে ফেলছিস।"

সে হেসে বলল, "অনেক ভেবেচিন্তে এটা করছি। এক ধরনের এক্সপেরিমেন্ট। তোমরা হঠাৎ দেখছ বলে অন্য রকম লাগছে।"

তাই হয়তো হবে। তাদের এক্সপেরিমেন্টে আমি এবং গুলতেকিন বাধা দিলাম না তবে একবার বেশ খারাপ লাগল। এদের নিয়ে খেলনার দোকানে গিয়েছি- নাবিলের একটা খেলনা পছন্দ হলো। তার বাবা বলল, নাবিল তিন নম্বর আইনটি কি বলো তো?

নাবিল গড়গড় করে বলল, "মাসে একটির বেশি খেলনা পাওয়া যাবে না।"

"তুমি কি এই মাসে খেলনা পেয়েছ?"

"হ্যাঁ।"

"তাহলে এটি চাচ্ছ কেন।"

"আমার খুব পছন্দ হয়েছে।"

"তিন নম্বর আইন কি বলে? পছন্দ হলেই পাওয়া যাবে?"

"না।"

নাবিল ব্যাকুল হয়ে কাঁদতে লাগল।

"কাঁদলে লাভ হবে না ব্যাটা। এক নম্বর আইন কি বলে?"

সে কাঁদতে কাঁদতে বলল, "এক নম্বর আইন বলে কাঁদলে কিছু পাওয়া যাবে না।"

"তাহলে কাঁদছ কেন?"

"কান্না থামাতে পারছি না তাই কাঁদছি।"

আমি আর থাকতে পারলাম না। বললাম, "বাংলাদেশের একটা কঠিন আইন আছে। সেই আইন বলে– বড় ভাইরা ইচ্ছে করলে ছোট ভাইদের আইন ভাঙতে পারে। সেই বাংলাদেশী বিশেষ আইনে তোমাদের প্রথম আইন ভঙ্গ করা হলো। এখন তোমাকে তোমার প্রিয় জিনিস কিনে দেয়া হবে। এসো আমার সঙ্গে।"

নাবিল আশা ও নিরাশা নিয়ে তাকাল তার বাবার দিকে। তার বাবা বলল, "বাংলাদেশী বিশেষ আইনের ওপর তো আর কথা চলে না। যাও তোমার বড় চাচার সঙ্গে।"

আমেরিকায় যা দেখে আমি সবচে' কষ্ট পেয়েছি তা হলো প্রবাসী বাঙালিদের ছেলে-মেয়ে। তারা বড়ই নিঃসঙ্গ। হ্যাঁ, বাবা-মা তাদের আছে, বন্ধুবান্ধব আছে, কিন্তু দু'কূল ভাসানো আদর কোথায়? পরিষ্কার মনে আছে আমার শৈশবের একটি বড় অংশ কেটেছে আত্মীয়স্বজনদের কোলে কোলে। আদরে মাখামাখি হয়ে। নানার বাড়ির কথা। গভীর রাতে ঘুম ভেঙ্গে গেল। মা'কে ডেকে তুলে বললাম ঘুম আসছে না। কোলে করে মাঠে হাঁটলে ঘুম আসবে। মা বিরক্ত মুখে বললেন, কি যন্ত্রণা। দিব পাখা দিয়ে এক বাড়ি। খালারা চেঁচিয়ে উঠলেন– আহা আহা আহা। তিন মামা বের হয়ে এলেন কোলে নিয়ে মাঠে হাঁটার জন্যে। শুধু হাঁটলে হবে না। হাঁটতে হাঁটতে গল্প বলতে হবে। আকাশ ভরা ফকফকা জোছনা। মাঠ ভর্তি জোছনার ফুল। সেই শৈশব এরা কোথায় পাবে?

নিউ জার্সির প্রবাসী বাঙালিদের ছেলেমেয়েদের অবস্থা অবশ্যি তত খারাপ

নয়। এরা একসঙ্গে হেসে-খেলেই বড় হচ্ছে। বাংলা শেখার স্কুল আছে, নাচের স্কুল আছে। গানের স্কুল আছে। প্রবাসী বাঙালিদের বৃদ্ধ বাবা-মারা দেশ থেকে নাতি-নাতনিদের দেখতে যাচ্ছেন। তিন মাস, তিন মাস করে থাকছেন।

প্রবাসী বাঙালিদের অভিমত হলো– প্রথম জেনারেশনেই শুধু প্রবাসে থাকার কষ্ট ভোগ করবে। দ্বিতীয় জেনারেশন করবে না, কারণ তাদের বাবা, মা, ভাই, বোন সব এই দেশেই থাকবে। তৃতীয় জেনারেশনে এরা শুধু যে বাবা-মা পাবে তাই না, খালা-খালু চাচা-চাচী সবই পেয়ে যাবে।

আমি তাদের যুক্তি মেনে নিলাম, অবশ্যি মনে মনে বললাম, সবই পাবে। শুধু পাবে না 'দেশ'।

পরে ভেবে দেখলাম আমার এই কথাও তো ঠিক নয়। দেশ কেন পাবে না? দেশ হবে আমেরিকা। তাতে ক্ষতি কি। আসলে আমরা কি বিশ্ব নাগরিক নই? পৃথিবী হচ্ছে আমাদের জন্মভূমি– এটা ভাবলেই সব সমস্যার সমাধান।

যখন বয়স কম ছিল তখন বিদেশে থেকে যাওয়া বাংলাদেশীদের কথা ভাবলে খানিক মন খারাপ হতো। এখন হয় না। এখন মনে হয় কর্ম এবং জীবিকার খাতিরে দেশত্যাগে ক্ষতি কি? বাংলাদেশের মানুষ ছড়িয়ে পড়ুক পৃথিবীময়। জনসংখ্যার ভারে পর্যুদস্ত বাংলাদেশের এতে লাভ বই ক্ষতি হবে না। প্রবাসী ইহুদিদের কল্যাণেই তো আজ ইসরাইল এত ক্ষমতাবান একটি দেশ। বাংলাদেশের ক্ষেত্রেও তাই হবে।

আমি নিউ জার্সিতে তার লক্ষণও দেখলাম। বাংলাদেশ সমিতি নামে নিউ জার্সির যে সমিতি তা দেশের জন্যে ক্রমাগত কাজ করে যাচ্ছে। দেশের যে কোনো বিপদে যে পরিমাণ অর্থ তারা দান করছে তার পরিমাণ শুনলে মাথা ঘুরে যায়। একনায়কতন্ত্রের বিরুদ্ধে প্রবাসী বাঙালিদের গৌরব উজ্জ্বল ভূমিকার কথাও তো আজ আমাদের জানতে বাকি নেই।

প্রসঙ্গক্রমে প্রবাসী বাঙালি পরিবারের একজনের কথা বলি। তিনি ছেলের জন্মদিন করবেন। দাওয়াতের চিঠি পাঠালেন। চিঠিতে লেখা– আমার ছেলের জন্মদিন উপলক্ষে উপহার কেনা বাবদ যে পরিমাণ অর্থ আপনি বরাদ্দ করে রেখেছিলেন দয়া করে সেই অর্থ– বাংলাদেশ সাহায্যকল্প প্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠান সেবায় দান করুন।

বাংলাদেশ সোসাইটি শিল্প-সাহিত্যের ধারাটি তাদের মধ্যে প্রবাহিত রাখার অংশ হিসেবে দেশের নামি কবি-সাহিত্যিক দাওয়াত করে নিয়ে যাচ্ছেন। অনুষ্ঠান করছেন। এই তো কিছুদিন আগে ঘুরে গেলেন কবি শামসুর রাহমান।

আমি থাকতে থাকতেই সঙ্গীত অনুষ্ঠান হলো কাদেরী কিবরিয়ার। সবার মধ্যে কত আনন্দ, কত উৎসাহ।

ষোলই ডিসেম্বরে বিজয় দিবস উৎসব হবে। দীর্ঘদিন ধরে চলছে তার রিহার্সেল। কত না উত্তেজনা সবার মধ্যে। দেখে বড় ভালো লাগল। অসহায় বাংলা মা'কে এরা ভুলেন নি– এই জীবনে ভুলতে পারবেনও না। বাংলাদেশ আর কিছু পারুক না পারুক এক দল পাগল ছেলে তৈরি করে পৃথিবীময় ছড়িয়ে দিয়েছে। যারা বাংলাদেশ ছাড়া আর কিছুই ভাবতে পারে না।

বন্দরের কাল হলো শেষ।

এখন ফিরে যাবার পালা। যেসব স্মৃতি নিয়ে ফিরছি তার বেশিরভাগই সুখ স্মৃতি নয়। তবু জানি প্লেনে ওঠা মাত্র মনে হবে কিছু চমৎকার সময় আমেরিকায় কাটিয়ে গেলাম। পাখি এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় উড়ে যায় কিন্তু ফেলে যায় তার একটি পালক।

দেশে রওনা হবার দু'দিন আগে ভ্রাতৃবধূ ইয়াসমিন বলল, "দাদাভাই চলুন আপনাকে এমন একটা জায়গায় নিয়ে যাই যার স্মৃতি অনেক দিন আপনার মনে থাকবে।"

"কোন জায়গা বলতো?"

"ওয়াশিংটন ডিসির স্মিথসোনয়ান ইন্সটিটিউট।"

"আগে একবার দেখেছি।"

"চাঁদের মাটি দেখেছেন?"

"চাঁদের মাটি তো বাংলাদেশেই দেখেছি। উনিশশ সত্তর সনে আমেরিকান এ্যাম্বেসি চন্দ্রশীলা নিয়ে এসেছিল।"

"চাঁদের মাটি হাত দিয়ে ছুঁয়ে দেখেছেন?"

আমি বিস্মিত হয়ে বললাম, "চাঁদের মাটি হাত দিয়ে ছুঁয়ে দেখা যায়?"

"হ্যাঁ যায়। মিউজিয়ামে সেই ব্যবস্থা আছে। যাবেন?"

"অবশ্যই যাব। চাঁদের মাটি স্পর্শ করা তো চাঁদকে স্পর্শ করা। এই সুযোগ পাওয়া যাবে তাই তো কখনো কল্পনা করিনি।"

আনন্দে আমার চোখ ঝলমল করতে লাগল। ইয়াসমিন হাসতে হাসতে বলল, আমি জানতাম চন্দ্রশীলা হাত দিয়ে ছোঁয়া যায় শুনে আপনি খুব একসাইটেড ফিল করবেন। এই কারণেই সবার শেষে আপনার জন্যে এই প্রোগ্রাম রেখে দিয়েছি।

সারাদিন গাড়ি চালিয়ে বিকেলে পৌঁছলাম মিউজিয়ামে। অনেক কিছুই দেখার আছে সেখানে– রাইট ব্রাদার্সের তৈরি প্রথম বিমান, যে লুনার মডিউল চাঁদে নেমেছিল– সেই লুনার মডিউল আরো কত কি...।

কিছুই দেখলাম না, এগিয়ে গেলাম চন্দ্রশিলার দিকে।

উঁচু একটি আসনে চাঁদের মাটি সাজানো। উপরে লেখা এই চন্দ্রশিলা হাত দিয়ে স্পর্শ করা যাবে।

আমি এবং গুলতেকিন একসঙ্গে চাঁদের পাথরে হাত রাখলাম। আমার রোমাঞ্চ বোধ হলো। গভীর আবেগে চোখে পানি এসে গেল। কত না পূর্ণিমার রাত মুগ্ধ চোখে এই চাঁদের দিকে তাকিয়ে বিস্ময় ও আবেগে অভিভূত হয়েছি। সেই চাঁদ আজ স্পর্শ করলাম। আমার এই মানব জীবন ধন্য।

আমেরিকার প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা বোধে মন দ্রবীভূত হলো। আমেরিকানদের অনেক দোষ-ত্রুটি, তবু তো এরা আমাকে এবং আমার মতো আরো অসংখ্য মানুষকে রোমাঞ্চ ও আবেগে অভিভূত হবার সুযোগ করে দিয়েছে। ধরা-ছোঁয়ার বাইরের যে চাঁদ তাকে নিয়ে এসেছে মাটির পৃথিবীতে। এই শতক শেষ হবার আগেই তারা যাত্রা করবে মঙ্গল গ্রহের দিকে। সমস্ত পৃথিবীর মানুষকে আবারো অভিভূত করবে। আমেরিকা আমি পছন্দ করি না তবু চন্দ্রশিলায় হাত রেখে মনে মনে বললাম– তোমাদের জয় হোক।

ইয়াসমিন ক্যামেরা হাতে একটু দূরে গিয়ে দাঁড়াল। কোমল গলায় বলল, "দাদাভাই হাসুন, আপনাদের ছবি তুলে রাখি। আপনি চাঁদের মাটিতে হাত দিয়ে এমন মন খারাপ করে দাঁড়িয়ে আছেন কেন?"